ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক

১৫তম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কাম্য

পার্শ্ববর্তী আরাকান রাজ্যের বাঙ্গালী মুসলিম ভাই-বোনেরা আবারও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। মিয়ানমারের সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাখাইন মগ দস্যুরা এবং নাসাকা পুলিশ বাহিনী সম্মিলিতভাবে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে রোহিঙ্গা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে গত ৮ই জুন শুক্রবার থেকে। যুলুম ও অত্যাচারের এমন কোন দিক নেই, যা এই নরপশুরা চালিয়ে যাচ্ছে না নিরীহ মযলূম মুসলমানদের উপরে। ফলে ১৯৪২, ১৯৭৮ ও ১৯৯২-য়ের মত ২০১২-তে এসে তারা আবারও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হ'ল। বিগত দিনেও তারা প্রতিবেশী বাংলাদেশ-এর টেকনাফ অঞ্চলে আশ্রয়ের জন্য ছুটে এসেছে। এবারও স্বাভাবিকভাবে তারা এদেশমুখী হয়েছে। সর্বস্বহারা মানুষগুলো যখন বাঁচার আশায় নৌকায় ভেসে পরিবার নিয়ে বাংলাদেশী দ্বীপগুলোর দিকে ছুটছে, তখন বর্বর বর্মী সেনাবাহিনী তাদেরকে নৌকাসহ ডুবিয়ে মারছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের আধা সামরিক বাহিনী বিজিবি তাদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছে পুনরায় বধ্যভূমি আরাকানের দিকে। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মানুষগুলি এভাবেই সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে অথবা ডুবে মরছে। সভ্য সমাজে এদৃশ্য কল্পনাতীত। বিগত দিনে বাংলাদেশ কখনো তাদের তাড়িয়ে দেয়নি। বরং আশ্রয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে মানবিক কারণে। কিন্তু এবার এ নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল। তাই বলতে হয়, অসহায় ডুবন্ত মানুষকে বাঁচানোই প্রথম কাজ, না তাকে নিয়ে রাজনীতি করাই প্রথম কাজ? পৃথিবীর সকল দেশ প্রতিবেশী দেশের নির্যাতিত আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। আমাদের জনগণও বিগত দিনে ভারতে এবং বর্তমান সময়ে ইরাক, লিবিয়া ও অন্যান্য হাঙ্গামাপূর্ণ দেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে আশ্রয় নিয়েছে। অথচ আজ আমরা নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দিয়ে যে অমানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম, তাতে আমাদের বিপদের সময় কেউ আশ্রয় দেবে কি-না সন্দেহ।

একটি বাম জাতীয় দৈনিকের কলামিষ্টের ভাষায় 'সংসদে পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপুমণি রোহিঙ্গা আন্দোলনের পিছনে জামায়াতে ইসলামীর উসকানি খুঁজে পেলেও ভাসমান মানুষের চোখের পানি দেখতে পাননি'। কথাটা অতীব সত্য। মিয়ানমারের যালেম সরকার ও শান্তিতে নোবেলজয়ী গণতন্ত্রী নেত্রী অং সান সুচি মযলূম রোহিঙ্গাদের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন, তাদেরকে যে ভাষায় তারা কটূক্তি ও অপদস্থ করে চলেছেন, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় একই ভাষায় তাদের প্রতি তীর্যক মন্তব্য করেছেন। কথিত গণতন্ত্রী নেত্রী নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যা অং সান সুচির প্রতি সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে করণীয় কি বলে আপনি মনে করেন? হাস্যোজ্জ্বল সুচি তখন বলে ওঠেন, রোহিঙ্গা! তারা আবার কারা? তিনি এখন এদেরকে কধষধ অর্থাৎ 'বিদেশী' বলছেন। সুচির দল এন,এল,ডি-র এক এম,পি গত এপ্রিলে তার সশস্ত্র ক্যাডারদের প্রথম রোহিঙ্গাদের উপর লেলিয়ে দিয়ে দাঙ্গা বাঁধান। আর তখন থেকেই রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সমূহ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে উত্তেজনা ছড়াতে শুরু করে। অতঃপর ৮ই জুন থেকে সুপরিকল্পিত

ভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। অথচ সুচি হয়ত ভুলে গেছেন যে, তার পিতা অন সানের অন্যতম প্রধান সহযোগী রাজনীতিক ছিলেন মুসলমানদের নেতা উ, রাযাক। শিক্ষা ও পরিকল্পনামন্ত্রী হিসাবে তিনি রোহিঙ্গা মুসলিম ও বৌদ্ধ বার্মিজ সকলের নিকটে সমান জনপ্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সহিংসতায় সুচির পিতার সাথে তিনিও নিহত হন। অথচ আজ সুচি তার পিতার বন্ধুকে চিনেন না। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে, শান্তির মেডেলধারী সুচি তখন ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছেন। উচিত ছিল তার সব ফেলে ছুটে যাওয়া নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পাশে। হয়তবা তাতেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যেত।

তাদেরকে 'অপরাধপ্রবণ' জাতি বলে কাঁটা ঘায়ে নূনের ছিটা দেওয়া হচ্ছে। অথচ ২০ লক্ষ মুসলিম অধ্যুষিত একটা জাতিকে ঢালাওভাবে 'অপরাধপ্রবণ' বলা যে কত বড় অপরাধ তা যে কেউ বুঝতে পারেন। বরং বর্মী জলদস্যুদের হামলায় এক সময়ে পর্যুদস্ত বাংলাদেশে আজও 'বর্গী হামলা' ও 'মগের মুল্লুক' বলে প্রবাদবাক্য চালু আছে। সে সময়ের লুটপাটকারী এইসব বর্মী দস্যুরা তাদের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী আজও 'রাখাইন' নামে আরাকানী মুসলমানদের উপর সশস্ত্র দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। রখ-ইঙ্গ অর্থ রাক্ষস ভূমি। হ্যাঁ, এ নামে পরিচিত হ'তে তারা আদৌ লজ্জাবোধ করে না। কারণ আসলে তারা রাক্ষসই বটে। এইসব নর রাক্ষসদের খোরাক হ'ল শান্তিপ্রিয় মুসলিম বাঙ্গালী রোহিঙ্গা জাতি। বিগত পঞ্চাশের দশকে বার্মার সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ১৮০টির বেশী স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সকলে অস্ত্র হাতে নিলেও রোহিঙ্গারা তা করেনি। বরং তাদের নেতা উ, রাযাক সুচির পিতা অং সানের সাথে মিলে শান্তি পূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছিলেন এবং তাতে তিনি অং সানের সাথে নিহত হয়েছিলেন।

অপরাধপ্রবণতা মানুষের স্বভাবজাত। যখন সে অপরাধ করে, তখন সে দায়ী হয়। কিন্তু কেউ অপরাধ করলে পুরা জাতিকে অপরাধী বলা যায় না। সম্প্রতি সঊদী আরবে ৮ জন বাংলাদেশীর এবং দুবাইয়ে দু'জন বাংলাদেশীর শিরোশ্ছেদ করা হয়েছে খুনের মত কঠিন অপরাধের কারণে। তাই বলে কি বাংলাদেশীরা সবাই খুনী? এর পরেও রোহিঙ্গারা সেদেশে যে নাগরিকত্বহীন মানবেতর জীবন যাপন করছে এবং আমাদের দেশে তাদের যারা শরণার্থী শিবিরে আছে, তারা কি স্বাভাবিক মানবাধিকার ভোগ করতে পারছে? তাই জীবনের তাকীদে তাদের কেউ যদি কোন অপরাধ করেই বসে, তাই বলে তাদের পুরা জাতিকে 'অপরাধপ্রবণ' বলে অভিহিত করা কারু জন্যই সমীচীন নয়। সবচেয়ে বড় কথা এদেশী যেসব পাপিষ্ঠ তাদেরকে নানা অপকর্মে বাধ্য ও প্ররোচিত করছে, সরকার তাদের কি বলে আখ্যায়িত করবে?

রোহিঙ্গাদের ইতিহাস :

রোহিঙ্গারা আরাকান রাজ্যের আদি বাসিন্দা। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবে যখন থেকে ইসলামের আবির্ভাব হয়, তখন থেকে চট্টগ্রামের ন্যায় এখানেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে *(থিসিস পৃঃ ৪০৩)*। অনেকে সূফীদের কথা বলেন। কিন্তু এটা ভুল। কেননা ইসলামের প্রাথমিক ও স্বর্ণযুগে কথিত সূফীবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বহু পরে তিব্বত হয়ে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। অতঃপর আরাকান হ'ল টেকনাফের পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ নাফ নদীর পূর্ব পাড়ে ৭২ মাইল দীর্ঘ দুর্লংঘ্য ও সুউচ্চ ইয়োমা (ণড়সধ) পর্বতমালা বেষ্টিত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী প্রায় ১৫ হাযার বর্গমাইল ব্যাপী একটি সমতল ভূমি। এটাকে প্রাচীন রাহমী (رهمي) রাজ্যভুক্ত এলাকা বলে ধারণা করা হয়। যাকে এখন 'রামু' বলা হয়। তৎকালীন রাহমী রাজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য এক কলস আদা উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। যা তিনি ছাহাবীগণকে বণ্টন করে দেন *(থিসিস, পৃঃ ৪২৫)*। এতে ধরে নেওয়া যায় যে, তখন থেকেই এখানে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এবং স্থানীয় রাজাসহ সাধারণ অধিবাসীরা ইসলামকে সাদরে বরণ করেছে। জাহায ডুবির কারণেও বহু আরব এখানে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিয়ে-শাদী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ইসলাম আগমনের বহু পরে ভারত থেকে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধরা তাদের আদি বাসভূমি ভারত ছেড়ে থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, তিব্বত, মিয়ানমার, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হয়। ভারত এখন প্রায় বৌদ্ধশূন্য বলা চলে। অথচ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। মধ্যযুগে আরাকানের রাজধানীর নাম ছিল ম্রোহাং। সেটারই অপভ্রংশ হ'ল রোহাং বা রোসাঙ্গ এবং সেখানকার অধিবাসীরা হ'ল রোহিঙ্গা। ১৪৩০ থেকে ১৭৮৫ খৃঃ পর্যন্ত সাড়ে তিনশ' বছরের অধিক সময় আরাকানের রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। এখানকার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী মুসলমান। আর মুসলিমদের শতকরা ৯২ জন হ'ল রোহিঙ্গা। ১৪৩৪ থেকে ১৬৪৫ খৃঃ পর্যন্ত দু'শো বছরের অধিক কাল যাবৎ কলিমা শাহ, সুলতান শাহ, সিকান্দার শাহ, সলীম শাহ, হুসায়েন শাহ প্রমুখ ১৭ জন রাজা স্বাধীন আরাকান রাজ্য শাসন করেন। তাদের মুদ্রার এক পিঠে কালেমা ত্বাইয়িবা ও অন্য পিঠে রাজার নাম ও সাল ফারসীতে লেখা থাকত। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন বাংলা ভাষার চরমোন্নতি সাধিত হয়। কবি আলাওল, দৌলত কাযী, মরদান শাহ প্রমুখ কবিগণ আরাকান রাজসভা অলংকৃত করেন। আজকে যেমন বাংলা ভাষার রাজধানী হ'ল ঢাকা, সেযুগে তেমনি বাংলা ভাষার রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। এক সময় আকিয়াবের চাউল বন্যা উপদ্রুত বাংলাদেশের খাদ্যাভাব মিটাতো। মগদস্যুদের দমনে শায়েস্তা খাঁকে তারাই সাহায্য করেছিল। যার ফলে মাত্র ৩৬ ঘণ্টায় তাঁর পক্ষে চট্টগ্রাম জয় করা ও মগমুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। তাই রোহিঙ্গাদের নিকট বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ঋণ অনেক বেশী। আজ তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমাদের নিকট আশ্রয়প্রার্থী। আমরা কি পারি না এই সুযোগে তাদের ঋণের কিছুটা হলেও পরিশোধ করতে? প্রশ্ন জাগে, কোলকাতার বাঙ্গালীদের প্রতি সরকারের যতটা গলাগলি, আরাকানের বাঙ্গালীদের প্রতি তার বিপরীত কেন? তারা নির্যাতিত মুসলমান, সেজন্যেই কি?

রাজনৈতিক অবস্থান :

১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম দখল করে নেওয়ার আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। তাছাড়া প্রাকৃতিক দিক

দিয়ে দুর্গম ইয়োমা পর্বতমালা আরাকানকে বার্মা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সেকারণ নাফ নদীর তীরবর্তী টেকনাফ, বান্দরবন, কক্সবাজার ও সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানের সবচাইতে নিকটতম ও সুগম্য এলাকা। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন বৃটিশ ও ভারতীয় হিন্দু নেতারা কাশ্মীর, জুনাগড়, হায়দরাবাদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য সমূহের ন্যায় আরাকান রাজ্যকেও ১৯৩৭ সালে বার্মার সাথে জুড়ে দেয়। অথচ ধর্ম, ভাষা ও ভৌগলিক কারণে এটা বাংলাদেশেরই অংশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে এখানে কাশ্মীরের ন্যায় স্থায়ীভাবে রক্ত ঝরানোর ব্যবস্থা করা হয়। দেখা গেল যে, ১৯৪২ সালের এক অন্ধকার রাতে ইয়োমা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বর্মী শাসকদের উস্কানীতে নিরীহ আরাকানী মুসলমানদের উপর অতর্কিতে হামলা চালালো হিংস্র মগ দস্যুরা এবং মাসাধিককাল ব্যাপী হত্যাযজ্ঞে প্রায় এক লাখ মুসলমানকে তারা হত্যা করল। বিতাড়িত হ'ল কয়েক লাখ মুসলমান। এরপর ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বৃটিশের কাছ থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হ'তে নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলে। তাদের জন্য বার্মার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। ফলে তারা নিজ গৃহে পরবাসী হয়ে যায়। এইভাবে শত শত বছর ধরে মুসলিম ও বৌদ্ধ একত্রে বসবাসকারী নাগরিকদের স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকারে পরিণত করা হয়। বার্মিজ বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা আরাকানী বৌদ্ধ রাখাইনদের সাথে মিলে আরাকানকে মুসলিমশূন্য করার মিশনে নেমে পড়ে। আদি ফিলিস্তিনীদের হটিয়ে যেমন সেখানে বাইরের ইহুদীদের এনে বসানো হচ্ছে, একইভাবে আদি রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করে সেখানে রাখাইনদের এনে বসানো হচ্ছে। অথচ পৃথিবী নির্বিকার।

এক্ষণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রধান দায়িত্ব হবে রোহিঙ্গাদের উপর বর্মী সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং ১৯৪২ সালের পূর্বের ন্যায় তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। অথবা তাদেরকে স্বাধীন আরাকান রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। বাংলাদেশ আরাকানের নিকটতম প্রতিবেশী মুসলিম দেশ। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী দুই বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত ও চীন মুখে কুলুপ এটে মজা দেখছে। এমতাবস্থায় যদি আমরা এই মহা বিপদে তাদের সাহায্য করি, তাহ'লে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। বিশ্বসভায় আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি আগামী দিনে রোহিঙ্গারাই হতে পারে আমাদের ব্যবসায়িক সহযোগী ও পূর্বমুখী কূটনীতির সেফ গার্ড। অথবা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যদি আমরা আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসন করে দিই, তাহ'লে বিগত দিনে তারা যেভাবে পাহাড়-জঙ্গল কেটে আরাকানকে সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করেছিল, সেভাবে তারা আমাদের পার্বত্য অঞ্চলকে আবাদ করে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারে। এ ছাড়া পার্বত্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এবং দেশের এক দশমাংশের বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন দমনে এরাই হতে পারে সরকারের শক্তিশালী হাতিয়ার।

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে, জাতিসংঘ সহ বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করছে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবার জন্য। অথচ অত্যাচারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে না। এতে ধরে নেওয়া যায় যে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দাবাড়ুদের ইঙ্গিতেই মিয়ানমার সরকার এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে অবশ্যই ঈমানী শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে বিপন্ন ভাই-বোনদের পাশে। ইনশাআল্লাহ তাতে আল্লাহ্র গায়েবী মদদ নেমে আসবে বাংলাদেশে। ১৯৬০ সালে গবর্ণর যাকির হোসায়েনের দৃঢ় ভূমিকায় ভীত হয়ে অত্যাচারী জেনারেল নে উইন যেমন তার ঠেলে দেওয়া বিশ হাযার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে ফিরিয়ে নিতে ও তাদের বাড়ীঘরে সম্মানজনক পুনর্বাসনে বাধ্য হয়েছিল, আজকে আমাদের সরকার তেমনি শক্ত ভূমিকা নিলে মিয়ানমার সরকার প্রমাদ গণতে বাধ্য হবে। তাই প্রতিবেশী মুসলিম দেশ হিসাবে আমাদেরই দায়িত্ব রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাওয়া।

আগামী ১৫ই জুলাই মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে আসছেন। তাঁর সামনে সর্বাগ্রে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা প্রার্থনা করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ হ'তে মুক্ত কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হ'তে অভিভাবক প্রদান কর এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হ'তে সাহায্যকারী প্রেরণ কর' *(নিসা ৪/৭৫)*। আল্লাহ্র এই একান্ত আহ্বান অবিশ্বাসী-কাফের সুচি-সোনিয়া-হুজিনতাওদের প্রতি নয়, বরং এ আহ্বান ইসলামে বিশ্বাসী শেখ হাসিনাদের প্রতি। যাদের হাতে বর্তমানে আল্লাহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করেছেন। এক্ষণে যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করি, তাহ'লে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যাব। যে গযবের হাত থেকে ফেরাঊন-নমরূদরা বাঁচতে পারেনি। তাই শুধু আমরাই নই, বিশ্বের যে প্রান্তে যে মুসলমান বসবাস করছে, বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রনেতাগণ ও মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবেরগণ এবং অর্থ-সম্পদের অধিকারী দেশের ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণী ও মানবতাবাদী সকল মানুষকে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। সেই সাথে আমাদের সরকার ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের একান্ত আহ্বান, রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করুন!

সকালে রাস্তায় হাঁটছি। হঠাৎ নযর পড়ল শত শত কাকের সমস্বরে কা কা ডাকের প্রতি। দেখলাম নীচে পড়ে আছে একটা আহত কাক। ঠিকভাবে চলতে পারছে না। আমাদের একজন কাকটাকে ধরে উড়িয়ে দিল। অতঃপর কাকের দল সব চলে গেল। স্থানটি ফাঁকা হয়ে গেল। দেখলাম, কাকের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও মমত্ববোধ। সেই সাথে পারস্পরিক ঐক্য ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য। আমরা কি তাহ'লে কাকের চাইতেও অধম? ১৯৭৮ সালে নিজে গিয়েছি সাথীদের নিয়ে। শরণার্থী শিবিরে তাদের দুঃখ-কষ্টের সাথী হয়েছি। ১২ দিন বর্ষা-কাদায় ভিজে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করেছি। ১৯৯২-য়ে সাথীদের পাঠিয়েছি। অথচ ২০১২-তে কিছুই করতে পারছি না। তাই নির্যাতিত রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করছি, 'হে আল্লাহ! তুমি যালেমকে পাকড়াও কর ও মযলূমকে সাহায্য কর- আমীন! *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/২৫ শেষ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

কুরআনের মু'জেযা হওয়ার প্রমাণ সমূহ

১. কুরআনের অপরিবর্তনীয়তা :

কুরআন তার অবতরণকাল থেকে এযাবত একইভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। দেড় হাযার বছর পূর্বে যে কুরআন পাঠ করা হ'ত, এখনো সেই কুরআনই পাঠ করা হয়। তার একটি শব্দ ও বর্ণ পরিবর্তিত হয়নি বা মুছে যায়নি। অথচ তাওরাত, যবূর, ইনজীল প্রভৃতি মূল গ্রন্থের অস্তিত্ব দুনিয়াতে নেই।

২. বিশ্বময়তা :

যে রাতে নুযূলে কুরআনের সূচনা হয়, সে রাতে একজনই মাত্র শ্রোতা ছিলেন সৌভাগ্যবতী নারী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)। অথচ সেই কুরআন ক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে কোটি কোটি মানবসন্তান পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে ও ছালাতের বাইরে কুরআনের কিছু না কিছু অংশ হরহামেশা পাঠরত আছে। কুরআন বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, সূরা ফাতিহা প্রতিদিন যতবার পাঠ করা হয়, বিশ্বের কোন ভাষার কোন পাঠ্যাংশের সেই সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত হয়নি'। অনেক খৃষ্টান দার্শনিকের মতে ২০৫০ সালের মধ্যেই ইসলাম বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে'।[১] কুরআনই যে তার প্রধান কারণ তা বলাই বাহুল্য।

৩. নিজ ভাষাতেই পঠিত : যে আরবী ভাষাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল, সেই ভাষাতেই কুরআন সর্বত্র পঠিত হয়। খৃষ্টানরা বাইবেলের কথিত অনুবাদ পাঠ করে থাকে। তাও পাঠকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। যেকারণে বিশিষ্ট ইভানজেলিষ্ট জর্জ গ্যালাপের মতে, 'আমেরিকানরা হ'ল বাইবেল অন্ধ জাতি'। আরবী ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যাও পৃথিবীতে কোটি কোটি এবং তা ক্রমবর্ধমান। আরবী বর্তমানে জাতিসংঘের ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে বরিত। অথচ তওরাত, যবূর, ইনজীল প্রভৃতি ইলাহী গ্রন্থ যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল, সেই ভাষা বা বর্ণমালা এমনকি বেদ, যিন্দাবেস্তা প্রভৃতির ভাষা ও বর্ণমালা এবং সেসবের ভাষাভাষী কোন মানুষের অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীতে নেই।

উল্লেখ্য যে, হিব্রু (ইবরানী) যা তওরাতের ভাষা ছিল, খালেদী (خالدي) যা মসীহ ঈসার ভাষা ছিল, দুররাই (درّي) যা যিন্দাবিস্তার ভাষা ছিল, সংস্কৃত যা বেদ-এর ভাষা ছিল, এইসব ভাষা পৃথিবীর কোন দেশ এমনকি কোন যেলা বা মহল্লাতেও জনগণের মুখের ভাষা হিসাবে এখন চালু নেই। আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই ঐসব ভাষা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রেখে দেওয়া হয়েছে আরবী ভাষাকে। যা কুরআন-হাদীছের স্বার্থে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে যে বাইবেলের নতুন নিয়ম পাওয়া যায়, তাতে লেখা আছে Translated out of the original Greek known as the authorised version (মূল গ্রীক থেকে অনূদিত। যা অনুমোদিত ভাষান্তর হিসাবে পরিচিত)। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাইবেলের আরও version আছে। যা কোন কারণ বশতঃ গ্রহণযোগ্য হয়নি। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান বাইবেল গ্রীক ভাষা থেকে অনূদিত। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল ঈসা (আঃ) তো গ্রীসের লোক ছিলেন না। তার মাতৃভাষাও গ্রীক ছিল না। তিনি ফিলিস্তীনে জন্ম গ্রহণ করেন ও খালেদী ভাষায় তিন বছর ধর্ম প্রচার করেন। তাহ'লে ইনজীলের মূল ভাষা গ্রীক হ'ল কিভাবে?

আধুনিক সেক্যুলারিজমের কুপ্রভাব কুরআনের প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণে বিন্দুমাত্র ভাটা আনতে পারেনি। কেননা কুরআনের ভাষা সরাসরি আল্লাহ্র ভাষা। এটি হ'ল জান্নাতের ভাষা। কুরআনের প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও বর্ণ আল্লাহ্র নূরে আলোকিত। যা বিশ্বাসী মুসলমানের হৃদয় জগতকে আলোকিত করে। জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকার দূরীভূত করে। বিষাদিত অন্তরকে সুশীতল করে। মুমিনের হৃদয়ে কুরআনের প্রভাব তাই অতুলনীয় ও অনির্বচনীয়। যার প্রতি হরফে মুসলমান কমপক্ষে দশটি করে নেকী পায়। যা তার পরকালকে সমৃদ্ধ করে। মানছূরপুরীর হিসাব মতে কুরআনের সর্বমোট হরফের সংখ্যা ৩,৪৬,৯৯৮টি। বিশিষ্ট কুরআন গবেষক কনস্ট্যান্স প্যাডউইক তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'কুরআন তার অনুসারীদের অন্তরে জাগ্রত। তাদের কাছে এটি নিছক কিছু শব্দ বা কথামালা নয়। এগুলো আল্লাহ্র নূরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার জ্বালানী'। তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ শাসক কামালপাশা অতি উৎসাহী হয়ে আরবী আযান বাতিল করে তুর্কী ভাষায় আযান চালু করেন। পরে জনরোষে পড়ে পুনরায় আরবী আযান চালু করতে বাধ্য হন।

৪. কুরআনের হেফাযতকারী আল্লাহ : কুরআন একমাত্র ইলাহী গ্রন্থ যার হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি

১. *আমার দেশ ৮ জানুয়ারী'০৮, লেখক : মামুনুর রশীদ।*

বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'আমরা কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী *(হিজর ১৫/৯)*। তিনি বলেন, إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 'এর সংরক্ষণ ও পঠন আমাদেরই দায়িত্বে'। 'সুতরাং যখন আমরা তা (জিব্রীলের মাধ্যমে) পাঠ করাই, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন'। 'এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যা (হাদীছ) আমাদেরই দায়িত্বে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৭-১৯)*। অতএব আল্লাহ কেবল কুরআন-হাদীছের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই তা ক্বিয়ামত অবধি টিকে থাকবে। কিন্তু অন্যান্য এলাহী গ্রন্থের দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। তাই সেসব হারিয়ে যেতে বাধ্য।

৫. কুরআন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস :

কুরআন যারা মানেন এবং যারা মানেন না, সকলে কুরআনের বিভিন্নমুখী হেদায়াত থেকেই আলো নিয়েছেন। বরং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎসই হ'ল কুরআন। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য নেই। বিজ্ঞানীদের মতে কুরআনের প্রতি ১১টি আয়াত বিজ্ঞান বহন করে। এর দ্বারা তারা হয়ত কেবল বস্তুগত বিজ্ঞান সমূহের হিসাব করেছেন। কিন্তু এছাড়াও সেখানে রয়েছে সমাজ বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, সমর বিজ্ঞান ইত্যাদি। তাছাড়া রয়েছে জীবনের বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখাগত বিজ্ঞান। সে হিসাবে কুরআনের প্রতিটি আয়াতই বিজ্ঞান বহন করে। কুরআনী বিজ্ঞানের চর্চা করেই মুসলমানেরা কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিশ্ব বিজ্ঞানের নায়ক ছিল। অতঃপর বাগদাদ ও স্পেনের রাজনৈতিক পতনের ফলে বিজ্ঞানেরও পতন ঘটে এবং তাদেরই রেখে যাওয়া বিজ্ঞানের অনুসরণ করে বস্তুবাদী ইউরোপ আজ ক্রমে মুসলমানদের শূন্যস্থান পুরণ করে চলেছে। আজকের যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমরা দেখছি তার সবেরই উৎস রয়েছে কুরআনে। যা বর্ণিত হয়েছে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একজন মরুচারী নিরক্ষর নবীর মুখ দিয়ে- যা ছিল আল্লাহ্‌র কালাম। যেমন উদাহরণ স্বরূপ-

(১) জগত সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে বলা হয়, 'কোটি কোটি বছর পূর্বে বিশ্বজগত একটি মাত্র জড়বস্তু রূপে বিদ্যমান ছিল। পরে তার কেন্দ্রে একটি মহাবিস্ফোরণ ঘটে, যাকে Big-Bang বলা হয়। সেই মহা বিস্ফোরণের ফলে আমাদের সৌরজগত, ছায়াপথ, তারকারাজি ইত্যাদি সৃষ্টি হল এবং বিনা বাধায় সর্বত্র সন্তরণ করে চলল'। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এ তথ্য প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا 'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পরে মিলিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*।

(২) প্রাণের উৎস কি? এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রাণীজগতের উদ্ভব। অথচ কুরআন একথা আগেই বলেছে, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ 'আমরা প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করেছি পানি হতে। তবুও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' *(আম্বিয়া ২১/৩০; নূর ২৪/৪৫)*।

(৩) বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিটি প্রাণসত্তার মধ্যে রয়েছে বিপরীতধর্মী দু'টি শক্তির জোড়। যার একটি পজেটিভ বা প্রোটন এবং অপরটি নেগেটিভ বা ইলেকট্রন। এমনকি বিদ্যুতের ন্যায় প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও রয়েছে এই জোড়ার সম্পর্ক। অথচ কুরআন বহু পূর্বে এর তথ্য দিয়েছে, سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ 'মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি ভূ-উৎপন্ন সকল বস্তু এবং মানুষ ও তাদের অজানা সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন' *(ইয়াসীন ৩৬/৩৬)*। (৪) উদ্ভিদের জীবন আছে, একথা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ খৃ:) মাত্র সেদিন আবিষ্কার করলেন। অথচ বহু পূর্বেই একথা কুরআন বলে দিয়েছে। وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ 'নক্ষত্ররাজি ও উদ্ভিদরাজি আল্লাহকে সিজদা করে' *(রহমান ৫৫/৬; ইসরা ১৭/৪৪; নূর ২৪/৪১ প্রভৃতি)*। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানে পাথর ও বৃক্ষ সমূহ ঝুঁকে পড়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে।[২] এমনকি তাঁর হুকুমে ছায়াদার বৃক্ষ নিজের স্থান থেকে উঠে এসে তার নিকটে দাঁড়িয়েছে। আবার তাঁর হুকুমে স্বস্থানে ফিরে গেছে।[৩] এগুলো সবই উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, তার প্রমাণ বহন করে। (৫) এমনকি এর চাইতে বড় তথ্য কুরআন প্রকাশ করেছে, বিজ্ঞানীরা আজও যা প্রমাণ করতে পারেনি। আর তা হ'ল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রাণ আছে এবং আছে বোধশক্তি। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ 'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রবিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম অনুগত হয়ে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১১)*। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ও তন্মধ্যকার সবকিছু সর্বদা আল্লাহ্‌র গুণগান করে। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না। যেমন আল্লাহ

২. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৯১৮ 'মু'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ।*
৩. *মুসলিম, দারেমী, মিশকাত হা/৫৮৮৫, ৫৯২৪।*

বলেন, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْماً غَفُوْراً 'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যকার সবকিছু তাঁরই গুণগান করে। আর এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু ওদের গুণগান তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' *(ইসরা ১৭/৪৪)*। এগুলি সবই আল্লাহ্‌র আয়াত বা নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে তথ্য কেবলমাত্র কুরআনই আমাদেরকে প্রদান করেছে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

৬. ইসলাম প্রেরণের সুসংবাদ দাতা : কুরআনই একমাত্র ইলাহী গ্রন্থ, যা মানবজাতিকে আল্লাহ প্রেরিত স্বভাবধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে দ্বীন ইসলাম প্রেরণের সুসংবাদ দিয়েছে *(মায়েদাহ ৫/৩)*। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ এরূপ শুনাতে ব্যর্থ হয়েছে।

৭. অনন্য প্রভাবশালী গ্রন্থ :

কুরআনের অপূর্ব সাহিত্যিক মান, আলংকরিক বৈশিষ্ট্য, অনন্য বর্ণনাভঙ্গি এবং এর অলৌকিক প্রভাব যেকোন মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে মোহিত করে ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থে এর কোন নযীর নেই। (১) আবু জাহল, আবু সুফিয়ান, আখনাস বিন শারীক্ব-এর মত অতি বড় শত্রুরাও রাতের বেলা একে অপরকে লুকিয়ে গোপনে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর তাহাজ্জুদে পাঠ করা কুরআন মুগ্ধমনে শ্রবণ করত। পরপর তিনদিন একই ঘটনার পর আখনাস বিন শারীক্ব লাঠি হাতে হাঁটতে হাঁটতে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে এসে বললেন, হে আবু হানযালা! মুহাম্মাদের মুখ দিয়ে যা শুনলাম, সে বিষয়ে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, আমি ঐ কালাম বুঝতে পেরেছি এবং সেখানে যা চাওয়া হয়েছে, তাও বুঝেছি।' আখনাস বললেন, আমিও আপনার সাথে একমত। এবার তিনি হাঁটতে হাঁটতে আবু জাহলের বাড়ীতে গেলেন ও তাকে একই প্রশ্ন করলেন। জবাবে আবু জাহল বললেন, আসল কথা হ'ল, تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف বনু আবদে মানাফের সাথে আমাদের বংশ মর্যাদাগত ঝগড়া আছে। তারা বলে, আমাদের বংশে একজন নবী আছেন, যার নিকটে আসমান থেকে 'অহি' আসে। আমরা কিভাবে এটা সহ্য করব? অতএব আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনো তার উপর ঈমান আনব না বা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করব না। একথা শুনে আখনাস চলে এলেন'।[৪] (২) প্রসিদ্ধ কুরায়েশ নেতা উৎবা বিন রাবী'আহ একদিন আবু জাহল ও অন্য নেতাদের পরামর্শ মতে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এলেন। ইনি একই সাথে জাদুবিদ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী ও কবিতায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি এসে রাসূল (ছাঃ)-এর অনেক প্রশংসা করলেন। অতঃপর তাকে তাওহীদ প্রচার বন্ধের বিনিময়ে নেতৃত্ব, দশজন সুন্দরী স্ত্রী ও বিপুল ধন-সম্পদ দানের লোভ দেখালেন। রাসূল (ছাঃ) চুপচাপ শোনার পর তাকে সূরা হা-মীম সাজদাহ ১-১৩ আয়াত পর্যন্ত শুনালেন। এ সময় ওৎবা আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তার মুখে হাত দিয়ে কুরআন পাঠ বন্ধ করতে বললেন। ফিরে আসার পর তিনি নেতাদের কাছে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন কথা শুনেছি, যা আমার দু'টি কান কখনো শোনেনি। আল্লাহ্‌র কসম! এটি জাদু নয়, এটি কবিতা নয়, এটি কোন ভবিষ্যৎ কথন নয়। হে কুরায়েশগণ! তোমরা আমার কথা শোন! তোমরা এ মানুষটিকে ছেড়ে দাও। যদি তিনি আরবদের উপর জিতে যান, তাহ'লে তার বিজয় তোমাদের বিজয়। তার সম্মান তোমাদের সম্মান। তিনি কখনোই মিথ্যা বলেননি। আমি ভয় পাচ্ছি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযিল না হয়।' জবাবে আবু জাহল বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আপনাকে সে তার কথা দিয়ে জাদু করেছে'।[৫]

(৩) একদিন কা'বা চত্বরে উপস্থিত মক্কার মুশরিকদের একজন বাদে সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে সূরা নাজম শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে সূরার শেষে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পরবর্তীতে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একজন বৃদ্ধ কেবল সিজদা করেনি। সে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিজের কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। পরে তাকে আমি কাফের অবস্থায় নিহত হ'তে দেখেছি।' ঐ বৃদ্ধটি ছিল মক্কার অন্যতম নেতা উমাইয়া বিন খালাফ।[৬] (৪) সূরা ত্বোয়াহার অতুলনীয় প্রভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বহির্গত ওমর নিমেষে কুরআনের খাদেমে পরিণত হয়ে যান।[৭] (৫) জাফর বিন আবু তালিবের মুখে সূরা মারিয়ামের কয়েকটি আয়াত শুনে হাবশার বাদশাহ আছহামা নাজাশী ও তাঁর সভাসদ ধর্মীয় নেতাদের চক্ষু দিয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। অতঃপর মদীনায় নাজাশী প্রেরিত পণ্ডিতগণের সত্তর জনের এক শাহী প্রতিনিধিদল রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে সূরা ইয়াসীন শুনে কেঁদে আত্মহারা হয়ে পড়েন ও সেখানেই মুসলমান হয়ে যান। পরে

৪. *বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/২০৬; আল-বিদায়াহ ৩/৬৪।*

৫. *বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/২০৩-০৬।*

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৩৭ 'কুরআনের সিজদা সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৭. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৪২-৪৬।*

বাদশাহ নাজাশীও মুসলমান হন।[৮] (৬) কুরায়েশ-এর সবচেয়ে বড় ধনী ও বড় কবি অলীদ বিন মুগীরাহ একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে কুরআন শুনতে চাইলেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে সূরা নাহলের ৯০ আয়াতটি শুনিয়ে দেন। মুগীরাহ আবার শুনতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় পড়লেন। আয়াতটি শুনে হয়রান হয়ে তিনি বলে ওঠেন, وَاللهِ إِنَّ لَهُ لَحَلاَوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً، وَإِنَّ أَعْلاَهُ لَمُثْمِرٌ، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَمَا يَقُوْلُ هَذَا بَشَرٌ 'আল্লাহ্র কসম! এর রয়েছে এক বিশেষ মাধুর্য, এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ সজীবতা, এর শাখা-প্রশাখা সমূহ ফলবন্ত। এর জড়দেশ সদা সরস। আর মানুষ কখনো এরূপ বলতে পারে না।' তার এই প্রশংসাগীতি শুনে আবু জাহল এসে বলল, আপনি যতক্ষণ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলবেন, ততক্ষণ আপনার কওম আপনার উপর খুশী হবে না। তখন তিনি বললেন, ছাড়! আমাকে একটু ভাবতে দাও। অতঃপর ভেবেচিন্তে তিনি বললেন, هذا سحر يؤثر بأثره عن غيره 'এটি অন্য থেকে প্রাপ্ত জাদু! إن هذا إلا قول البشر 'এটি মানুষের উক্তি বৈ কিছু নয়'। বস্তুতঃ অলীদের প্রথম কথাগুলি ছিল তার মনের কথা। আর শেষের কথাগুলি ছিল রাজনৈতিক। এ প্রসঙ্গে সূরা মুদ্দাছ্ছির ১১-২৬ আয়াতগুলি নাযিল হয়।[৯] (৭) এর প্রভাব এত বেশী যে, ৩৬০টি দেবদেবীর পূজারী নিমেষে সবকিছু ছেড়ে এক আল্লাহ্র ইবাদতকারী বনে যান। কোন আইন মানতে যারা কখনোই বাধ্য ছিল না, সেই অবাধ্য মরু আরব নিমেষে আইনের সামনে এসে মাথা পেতে দেয়। পুলিশ বা কোন বাহিনীর প্রয়োজন হয়নি, নিজেরা এসে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বারবার পীড়াপীড়ি করে। (৮) বদরের যুদ্ধে বন্দী কুরায়েশ নেতা জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম মদীনায় উপনীত হয়ে মাগরিবের জামা'আতে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে সূরা তূরের আয়াতগুলি শুনে দারুণভাবে প্রভাবিত হন এবং মোটেই দেরী না করে সাথে সাথে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন।[১০] (৯) জাহেলী যুগের মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ 'আমেরী যার কবিতা সম্পর্কে বলা হ'ত اكتبوها على الحناجر ولو بالخناجر 'ঐ কবিতা নিজ গর্দানের উপরে লিখে নাও খঞ্জরের তীক্ষ্ণধার দিয়ে হলেও'- সেই মহান কবি ইসলাম কবুল করার পর কবিতা লেখা বন্ধ করে দিলেন। খলীফা ওমর (রাঃ) তাকে দরবারে ডাকিয়ে এনে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران

'আমি এক লাইন কবিতাও আর বলতে চাই না যখন থেকে আল্লাহ আমাকে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান শিক্ষা দিয়েছেন'।[১১] কা'বা গৃহে ঝুলানো তার বিখ্যাত মু'আল্লাক্বার পাশে টাঙিয়ে রাখা সূরা কাওছারের প্রথম আয়াতটি পাঠ করেই তিনি বলে ওঠেন, আল্লাহ্র অহী ব্যতীত এরূপ রচনা মানুষের সাধ্যের অতীত। অতঃপর তিনি মুসলমান হয়ে যান। জনৈক কবি উক্ত আয়াতের নীচে লিখে দেন, ليس هذا كلام البشر 'এটি মানুষের কালাম নয়'।[১২] (১০) আবু ত্বালহা আনছারী যখন কুরআনের আয়াত لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ 'তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু তোমরা দান করবে' *(আলে ইমরান ৩/৯২)* শোনার পরে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে নিজের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বাগিচা, তা আল্লাহ্র রাহে দান করে দিলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমে উক্ত বাগিচা আবু ত্বালহার নিকটাত্মীয় এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হ'ল।[১৩] (১১) শায়খ আব্দুল ক্বাহির জুরজানী (মৃঃ ৪৭৪ হিঃ/১০৭৮ খৃঃ) বলেন, আরবরা কুরআনের সর্বোচ্চ আলংকরিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তারা এর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত সমূহের কারণে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। যেমন وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে হে জ্ঞানীগণ! যাতে তোমরা সতর্ক হতে পারো' *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।[১৪] (১২) ১৯৭৪ সালে মিসরের ডঃ রাশাদ খলীফা (১৯৩৫-৯০), যিনি পরে মুরতাদ ও নিহত হন, তিনি কুরআনের অন্য একরূপ অলৌকিক মাহাত্ম্য আবিষ্কার করেন। তিনি কম্পিউটারের সাহায্যে পুরা কুরআনের সূরা আয়াত শব্দ ইত্যাদি গণনা করে দেখেন যে, সবকিছুই ১৯ দিয়ে গুণ করলে মিলে যায়। যেমন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম- ১৯টি বর্ণ দ্বারা গঠিত। সকল সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ রয়েছে। কিন্তু সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই। এর কারণ সেটা থাকলে সূরা নমলের ৩০

৮. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৩৫০; ইবনু কাছীর, মায়েদাহ ৮২ আয়াতের তাফসীর; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৩৬।*
৯. *আল-ইস্তী'আব, আল-ইছাবাহ, দালায়েলুন নবুঅত ২/১৯৯।*
১০. *ডঃ মুজীবুর রহমান, কুরআনের চিরন্তন মু'জেযা পৃঃ ১৪৩-৪৪।*
১১. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ্র শুরুতে, ১/১৯৯; গৃহীতঃ আল-ইস্ত 'আব ইবনু আব্দিল বার্র।*
১২. *কুরআনের চিরন্তন মু'জেযা, পৃঃ ১৪৭।*
১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৫ 'যাকাত' অধ্যায়।*
১৪. *কুরআনের চিরন্তম মু'জেযা পৃঃ ১৩৫।*

আয়াতের বিসমিল্লাহ সহ ১১৫টি বিসমিল্লাহ হ'ত। যা ১৯ দিয়ে গুণ করলে মিলত না। এইভাবে তিনি পুরা কুরআন গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা সঠিক হ'লে সেটাও কুরআনের একটা বিস্ময়কর দিক বলে গণ্য হবে, যা নিঃসন্দেহে অলৌকিক। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম তার্কিক আহমাদ দীদাত (১৯১৮-২০০৫) ১৯ তত্ত্বের একজন বড় প্রচারক।

যুগে যুগে বিজ্ঞান যত অগ্রগতি লাভ করবে, কুরআনের বিভিন্ন অলৌকিক বিষয় তেমনি মানুষের সামনে খুলে যাবে। তবে সাবধান থাকতে হবে, এর দ্বারা যেন কোন ভ্রান্ত আক্বীদা জন্ম না নেয়। যেমন ইরানের বাহাঈরা ইতিমধ্যেই ১৯ তত্ত্বে বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, বিশুদ্ধ আক্বীদা কেবল সেটাই, যা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল। তাঁদের যুগে যেটি দ্বীন বলে গৃহীত ছিল না, এখন সেটা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না। বস্তুতঃ কুরআনের প্রভাব অনন্য ও অলৌকিক।

৮. কুরআনের আহ্বান সমগ্র মানব জাতির প্রতি :

তওরাত, যবূর, ইনজীল প্রভৃতি কিতাবের আহ্বান কেবল বনু ইস্রাঈল গোত্রের প্রতি। কিন্তু কুরআনের আহ্বান জিন-ইনসান তথা জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি, এমনকি সকল প্রাণীর প্রতি। আল্লাহ বলেন, إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِيْنٌ، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا 'এটা তো উপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন'। 'যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতদেরকে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৯-৭০)*।

৯. কুরআন সকল শিক্ষা ও কল্যাণের সার-নির্যাস :

তওরাতে রয়েছে আখবার ও আহকাম, যবূরে কেবল প্রার্থনা, ইনজীলে রয়েছে দৃষ্টান্ত এবং কিছু আহকাম ও উপদেশ। অথচ কুরআনে রয়েছে ঐসবগুলি ছাড়াও বিগত জাতি সমূহের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্ব, দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবন পরিচালনার নীতিমালা ও বিধান সমূহ, জান্নাতের বিবরণ ও তার সুসংবাদ এবং জাহান্নামের বিবরণ ও তার ভয় প্রদর্শন, রয়েছে আল্লাহ ও আখেরাতের পরিচয় এবং রয়েছে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির সকল প্রকার হেদায়াতের সমষ্টি।

১০. কুরআন যাবতীয় ত্রুটি ও স্ববিরোধিতা হ'তে মুক্ত : যেমন আল্লাহ বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِند غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً 'তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করেনা? যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহলে ওরা তাতে অনেক গরমিল পেত' *(নিসা ৪/৮২)*। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা শুরুতেই নিজেকে لاَ رَيْبَ فِيْهِ 'সকল প্রকার ত্রুটি ও সন্দেহমুক্ত' বলে ঘোষণা করেছে *(বাক্বারাহ ২/২)*।

১১. কুরআন ভবিষ্যদ্বাণী, অতীত ইতিহাস ও ঘটনা সমূহের বর্ণনা সমৃদ্ধ এক জ্বলন্ত মু'জেযা :

বিগত দেড় হাযার বছরে পৃথিবীতে বহু কিছু ওলট-পালট হয়েছে। কিন্তু কুরআনের কোন বক্তব্য, অতীত ইতিহাস বা কোন ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি। যেমন, (১) পারসিকরা রোমকদের উপর বিজয়ী হ'ল। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস সিরিয়া ছেড়ে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে যেতে বাধ্য হলেন। এতে মক্কার মুশরিকরা খুশী হ'ল। কেননা পারসিকরা মূর্তিপূজারী ও অগ্নি উপাসক ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানেরা এতে দুঃখিত হ'ল। কেননা রোমকরা আহলে কিতাব ছিল। বিষয়টি আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন। জবাবে তিনি বললেন, রোমকরা সত্বর বিজয়ী হবে। এ বিষয়ে সূরা রূম ১-৬ আয়াত নাযিল হ'ল। এর বিরুদ্ধে কাফের নেতা উবাই বিন খালাফ আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গে ১০০ উটের বাজি ধরেছিল। দেখা গেল ৯ বছর পর বদর যুদ্ধের দিন রোমকরা বিজয়ী হ'ল *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। এভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হ'ল। তাতে বহু লোক মুসলমান হয়ে গেল। (২) অতীত ইতিহাস হিসাবে লূতের কওমের ধ্বংসের ঘটনা, যা কুরআনে বিবৃত হয়েছে *(হিজর ১৫/৭৫, ৭৭; আনকাবূত ২৯/৩৫)*। বর্তমান ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী ৭৭×১২ ব:কি: এলাকা ব্যাপী ৪০০ মিটার গভীরতার 'মৃত সাগর' যার বাস্তব প্রমাণ বহন করছে।[১৫] (৩) মূসার বিরুদ্ধে ফেরাঊনের সাগরডুবির পর তার লাশ অক্ষত থাকবে বলে কুরআন যে বক্তব্য দিয়েছিল *(ইউনুস ১০/৯২)*, তার মমিকৃত লাশ ১৯০৭ সালে সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে 'জাবালে ফেরাঊন' নামক পাহাড় থেকে উদ্ধার হওয়ার পর এখন তা দিবালোকের ন্যায় সত্যে পরিণত হয়েছে। যা এখন কায়রোতে আছে'।[১৬] এটি কুরআনের অকাট্য ও অভ্রান্ত সত্য হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে।

১২. শাশ্বত সত্য বাণী : বিজ্ঞান ও দর্শনের বহু তত্ত্ব ও তথ্য যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের কোন তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। কুরআনের শত্রুরা শত চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে।

যেমন, (১) এক সময় সূর্য ঘোরে, না পৃথিবী ঘোরে, এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল বিস্তর মতভেদ। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক বিজ্ঞানী পিথাগোরাস (খৃ: পূ: ৫৭০-৪৯৫) বলেন, পৃথিবী ঘোরে, সূর্য স্থির। তার আটশ' বছর পরে মিসরীয় বিজ্ঞানী

---

১৫. *নবীদের কাহিনী ১/১৬০, টীকা-১১৬।*
১৬. *নবীদের কাহিনী ২/১১ পৃঃ।*

টলেমী (৯০-১৬৮ খৃ:) বলেন, সূর্য ঘোরে পৃথিবী স্থির। তার প্রায় দেড় হাযার বছর পর পোলিশ বিজ্ঞানী কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃ:) বলেন, টলেমীর ধারণা ভুল। বরং পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য স্থির। অথচ আজ থেকে প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কুরআন ঘোষণা করেছে, كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ 'নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই সন্তরণশীল' *(আম্বিয়া ২১/৩৩; ইয়াসীন ৩৬/৪০)*। এখন বিজ্ঞানীরা সবাই একথা মেনে নিয়েছেন। (২) সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকে বলেন, নারী ও পুরুষ সবক্ষেত্রে সমান। এজন্য চলছে বিশ্বব্যাপী অনেক রাজনৈতিক হৈ চৈ। অথচ জীব বিজ্ঞান বলছে নারী ও পুরুষের মধ্যে আদপেই কোন সমতা নেই। দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সত্তা। উভয়ের ইচ্ছা-আকাংখা-কর্মক্ষেত্র সবই পৃথক। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এ সত্য বর্ণনা করেছে *(নিসা ৪/১ ও অন্যান্য)*। যা নিতান্তই বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত। (৩) কার্ল মার্কস তার বিপ্লবের দর্শনে বলেছেন, সদা গতিশীল প্রাকৃতিক বিধান সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায়। যার ফলে মানবজীবনেও বিপ্লব ও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে থাকে। এ দর্শন প্রচারের সাথে সাথেই তিনি 'দুনিয়ার মযদুর এক হও' বলে ডাক দিলেন। যা ছিল তার দর্শনের সাথে সংঘর্ষশীল।[১৭] কেননা সামাজিক বিপ্লব যদি ঐতিহাসিক কার্যকারণের অনিবার্য পরিণতি হয়, তাহ'লে সেজন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজন হবে কেন? আর রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলেই যদি বিপ্লব আনতে হয়, তাহ'লে ঐতিহাসিক কার্যকারণের অনিবার্য দর্শন নিতান্তই অমূলক গণ্য হয়। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই মানুষকে কর্মদর্শন প্রদান করে বলেছে, إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ 'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১৩/১১)*।

কুরআন প্রদত্ত আদর্শের সাথে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করলে এ ধরনের বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। অথচ কুরআন এসব থেকে মুক্ত।

১৩. কুরআনের বাহক ও প্রচারক মাত্র একজন : কুরআনই একমাত্র ইলাহী গ্রন্থ, যার বাহক ও প্রচারক মাত্র একজন। যিনি হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। মানছূরপুরী বলেন, অথচ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ-এর পেশকারী ঋষিদের সংখ্যা শতাধিক এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সময়ের ব্যবধান শতাধিক বছরের। বাইবেলের অবস্থাও তথৈবচ। এ কিতাবের পেশকারী হিসাবে তিনি ত্রিশজনের নামের তালিকা দিয়েছেন। যাদের মধ্যে হযরত মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, যাকারিয়া (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য বিদ্বানের নাম। যারা যুগে যুগে বাইবেল পেশ করেছেন। অথচ কোনটার সঙ্গে কোনটার পুরোপুরি মিল নেই। এমনকি হযরত মূসা (আঃ) যে দশটি ফলকে (عشرة الألواح) লিখিত তওরাত নিয়ে এসেছিলেন, তার উম্মত তাতে প্রথমেই সন্দেহ করেছিল। অনুরূপভাবে ইনজীলের অবস্থা। সেখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর শাগরিদদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাওয়া যায়। যার কোনটির সঙ্গে কোনটির পুরোপুরি মিল নেই। বরং প্রায় সবটাই কথিত সেন্ট তথা সাধুদের কপোলকল্পিত। যাকে আল্লাহ্র কেতাব বলে চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, মসীহ ঈসা নিজের জন্য ১২ জন শাগরিদ বাছাই করেছিলেন, যারা বনু ইস্রাঈলের বারো গোত্রের সামনে তাঁর দ্বীনের প্রচার করবে। কিন্তু এতবড় একজন কামেল উস্তাদের সঙ্গে থেকেও তারা এমন অযোগ্য প্রমাণিত হন যে, মসীহকে তাদের উদ্দেশ্যে একাধিকবার একথা বলতে হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্যে এক সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান থাকলেও তোমরা এরূপ বা ওরূপ করতে পারতে না'। মসীহ তাদেরকে বারবার তিরস্কার করতেন এজন্য যে, তাঁর সঙ্গে জেগে থেকে তারা কখনোই দো'আ-ইস্তেগফারে শরীক হ'ত না। মসীহের আসমানে উঠে যাবার পর উক্ত বারো শাগরিদের মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত বিষয়ে তীব্র মতভেদ সমূহ পরিলক্ষিত হয়। যেমন (১) শরী'আতের (তাওরাতের) বিধান সমূহ মান্য করা যরূরী কি-না (২) অন্য জাতির নিকটে ঈসায়ী ধর্মের প্রচার সিদ্ধ হবে কি-না (৩) খাৎনা করা কেবল ইসরাঈলীদের জন্য না ঈসায়ী ধর্মে আগত সকলের জন্য আবশ্যক ইত্যাদি। এরপরে তাদের মধ্যে আল্লাহ, মারিয়াম ও ঈসার নামে ত্রিত্ববাদের প্রসার ঘটে। ঈসা (আঃ) ৩০ বছর বয়সে দাওয়াত শুরু করেন এবং ৩৩ বছর বয়সে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। তিন বছরে মাত্র ১২ জন শাগরিদ হয়। যার মধ্যে একজন গাদ্দার প্রমাণিত হয়। অবশ্য 'কিতাবুল আ'মাল-এর লেখক সাধু লূক-এর মতে তাঁর সমর্থকের সংখ্যা ১২৪ জন ছিল।[১৮]

পক্ষান্তরে কুরআন শুরু হয়েছে যার মাধ্যমে, শেষও হয়েছে তাঁর মাধ্যমে। এর একটি শব্দ বা বর্ণেও অন্য কোন ব্যক্তি যুক্ত নন। কুরআন বুঝার জন্য অন্য কোন সহায়ক কুরআনও নাযিল হয়নি। যেমন হিন্দুদের ঋগ্বেদ বুঝতে গেলে সাম বেদ, অথর্ব্ব বেদ ইত্যাদির মুখাপেক্ষী হ'তে হয়। অনুরূপভাবে ইহুদী-খৃষ্টানদের নিউ টেষ্টামেন্ট পূর্ণতা পায় না ওল্ড টেষ্টামেন্ট

১৭. *মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মহাসত্যের সন্ধানে (ঢাকা ঃ ১৯৯৮), পৃঃ ৩৭।*

১৮. *মানছূরপুরী, রহমাতুল্লিল আলামীন ৩/১১২।*

ব্যতীত। আবার চারটি ইনজীল (أناجيل أربعة) ক্রটিযুক্ত থাকে সেন্ট লূক-এর কিতাবুল আ'মাল ব্যতীত। *আলহামদুলিল্লাহ* কুরআন নিজেই সবকিছুর ব্যাখ্যা تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ *(নাহল ১৬/৮৯)*। এরপরেও প্রয়োজনীয় ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য কুরআনের বাহক রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহ মওজুদ রয়েছে। যা আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট *(নাজম ৫৩/৩-৪; ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৯)*।

উল্লেখ্য যে, হিন্দুরা চারটি বেদ-এর কথা বললেও মনু তিনটি বেদ-এর কথা বলেন, যাতে অথর্ব্ব বেদ নেই। সংস্কৃতের কোন কোন পুরানো গ্রন্থে প্রায় ৩২টি বইয়ের উপরে বেদ-এর নাম ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া সাধারণ হিন্দুরা বেদকে 'ঈশ্বরের বাণী' মনে করলেও তাদের বহু বিদ্বান একে 'মানুষের কথা' বলে থাকেন এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক বর্তমান বেদ-কে আসল বেদ মনে করেন না।[১৯]

১৪. অত্যন্ত উঁচু মান ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন : কুরআনের ভাষা অত্যন্ত উঁচুমানের এবং মার্জিত রুচি সম্পন্ন। এতে কোনরূপ লজ্জাকর ভাষা ও ঘটনার স্পর্শ নেই। অথচ বেদ ও প্রচলিত বাইবেল নানা যৌনরসাত্মক উপমা ও রচনায় ভরা। যা ধর্মীয় পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর মৌলিক কারণ হ'ল এই যে, ঐসব প্রচলিত গ্রন্থাবলীর রচয়িতা হ'ল মানুষ। আর কুরআনের ভাষা হ'ল সরাসরি আল্লাহ্‌র। তাই বান্দার ভাষা কখনোই আল্লাহ্‌র ভাষার ধারে-কাছে যেতে পারে না। এজন্যই বলা হয়ে থাকে كلام الملوك ملوك الكلام 'বাদশাহ্‌র ভাষা হয় শাহী ভাষা'। কুরআনের ভাষা তাই যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা ও আবিলতার ঊর্ধ্বে এক অতুলনীয় সৌকর্যমণ্ডিত ভাষা। সেই সাথে কুরআনের ভাষা অতুলনীয় এবং সর্বোচ্চ অলংকার সমৃদ্ধ। কুরআন নাযিলের সময়কালের বরেণ্য আরবী কবিগণ যেমন কুরআনী বালাগাত ও অলংকারের কাছে অসহায় ছিলেন, আধুনিক যুগের কবি-সাহিত্যিকগণ একইভাবে রয়েছেন অসহায়।

মিসরের খ্যাতনামা মুফাসসির আল্লামা তানতাভী জাওহারী (মৃঃ ১৯৪০) জার্মান প্রাচ্যবিদদের সঙ্গে এক বিতর্কে কুরআনের ভাষাগত অলংকার ও তার অলৌকিকত্ব প্রমাণের জন্য তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'জাহান্নাম প্রশস্ত' এ বাক্যটির সর্বোচ্চ অলংকারপূর্ণ একটি আরবী বাক্য বলুন তো দেখি! তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কেউ বললেন, إِنَّ جَهَنَّمَ لَفَسِيْحَةٌ কেউ বললেন, إِنَّ جَهَنَّمَ لَوَاسِعٌ অতঃপর তানতাভী কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনালেন, يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ 'যেদিন আমরা জাহান্নামকে বলব, ভরে গেছ কি? সে বলবে, আরো আছে কি?' *(ক্বাফ ৫০/৩০)*। এ আয়াত শুনে তারা সাথে সাথে কুরআনের সামনে মাথা নত করলেন'।[২০] আমরা মনে করি এর পরবর্তী আয়াতে জান্নাতীদের পুরস্কার সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তা একইভাবে অলংকারপূর্ণ। যেমন বলা হয়েছে لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ 'সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং আমাদের কাছে রয়েছে আরও অধিক' *(ক্বাফ ৫০/৩৫)*।

বস্তুতঃ অল্প কথায় সুন্দরতম আঙ্গিকে এমন আকর্ষণীয় বাক্যশৈলী আল্লাহ ব্যতীত আর কারু পক্ষে সম্ভব নয়। আর এভাবেই আরবদের উপরে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যারা ছিল সেযুগে শুদ্ধভাষিতায় বিশ্বসেরা। সেজন্য তারা নিজেদেরকে 'আরব' (عرب) অর্থাৎ শুদ্ধভাষী এবং অনারবদেরকে 'আজম' (عجم) অর্থাৎ 'বোবা' বলে অভিহিত করত।

আল্লাহ পাক তাঁর নবীদেরকে স্ব স্ব যুগের উপরে এভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। যেমন জাদুবিদ্যায় সেরা মিসরীয়দের পরাস্ত করার জন্য আল্লাহ নবী মূসাকে লাঠি ও হাতের তালুর জ্যোতির মো'জেযা দান করেন। চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা শাম দেশের অহংকারী নেতাদের পরাস্ত করার জন্য আল্লাহ নবী ঈসাকে অন্ধকে চক্ষুদান, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান, এমনকি মৃতকে জীবিত করার মো'জেযা দান করেন। অনুরূপভাবে শেষনবীকে মো'জেযা স্বরূপ অলংকারময় কুরআন দান করেন। যার সামনে আরব পণ্ডিতেরা কুরআন নাযিলের যুগে ও পরে সর্বদা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

১৫. একজন উম্মী নবীর মুখনিঃসৃত বাণী : কুরআনই একমাত্র ইলাহী গ্রন্থ যা তাওরাত ইত্যাদির ন্যায় ফলকে লিপিবদ্ধ আকারে দুনিয়াতে আসেনি। বরং সরাসরি উম্মী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সাথে সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই একমাত্র নবী, যিনি النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ বা 'নিরক্ষর নবী' হিসাবে অভিহিত হয়েছেন *(আ'রাফ ৭/১৫৭, ১৫৮)*। কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার এটাও একটি বড় প্রমাণ যে, যার মুখ দিয়ে দুনিয়াবাসী কুরআন শুনেছে, তিনি নিজে ছিলেন, 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর ব্যক্তি এবং মানুষ হয়েছিলেন নিরক্ষর সমাজে

---

১৯. *রহমাতুল্লিল আলামীন ৩/২৭৪-৭৫*।

২০. *ডঃ মুজীবুর রহমান, কুরআনের চিরন্তন মু'জেযা (ঢাকা : ৪র্থ সংস্করণ ২০০৬), পৃঃ ২২৬*।

(জুম'আ ৬২/২)। এমনকি আল্লাহ বলেন, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِه مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ 'আর আপনি তো এর আগে কোন বই পড়েননি এবং স্বহস্তে কোন লেখাও লিখেননি, যাতে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করতে পারে' *(আনকাবূত ২৯/৪৮)*। তিনি অন্যত্র বলেন, مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ 'আপনি জানতেন না কিতাব কি বা ঈমান কি?' *(শূরা ৪২/৫২)*। তাই কুরআনের ভাষা ও বক্তব্যে নিজের থেকে যোগ-বিয়োগ করার সকল প্রকার সন্দেহের তিনি ঊর্ধ্বে ছিলেন।

বস্তুতঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত দুনিয়াতে এমন কোন নবী আসেননি যার পবিত্র যবান দিয়ে সরাসরি আল্লাহ্র কালাম বের হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি শেষনবী (ছাঃ)-এর জন্য শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় দলীল ও একটি বড় মু'জেযা। মানছূরপুরী বলেন, খৃষ্টানদের সকলে এ বিষয়ে একমত যে, তাদের চারটি ইনজীলের (أناجيل أربعة) একটিও মসীহ ঈসার উপরে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নাযিল হয়নি। বরং এগুলি স্ব স্ব লেখকদের দিকে সম্পর্কিত। উক্ত প্রসিদ্ধ চারটি ইনজীল হ'ল, মথি (انجيل متى), মারকুস (مرقس), লুক (لوقا) এবং ইউহান্না (يوحنّا)। এগুলির পবিত্রতার পক্ষে খৃষ্টানদের যুক্তি হ'ল এই যে, এগুলি পবিত্র রূহ মসীহ ঈসা (আঃ)-এর সাহায্য নিয়ে লেখা হয়েছে'। তাদের এ দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহ'লে চারটি ইনজীলের পরস্পরের মধ্যে এত গরমিল কেন? যেগুলির বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি আদম ক্লার্ক, নূরটিন ও হারূণ প্রমুখ খৃষ্টান বিদ্বানগণের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, ইনজীলগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন সুযোগ নেই। পাদ্রী ফ্রেঞ্চ স্বীকার করেছেন যে, ইনজীলগুলির মধ্যে ছোট-বড় ৩০ হাযার ভুল রয়েছে। কথা হ'ল, চারটি ইনজীলের মিলিত পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ'-এর বেশী হবে না।[২১] অথচ তার মধ্যেই যদি ত্রিশ হাযার ভুল থাকে, তাহ'লে বিশুদ্ধ কতটুকু আছে? আর ঐসব বইয়ের গ্রহণযোগ্যতাই বা কি? একেই তো বলে 'সাত নকলে আসল খাস্তা।'

খ্রীষ্টান ধর্মনেতাদের এইসব দুস্কৃতির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ– 'ধ্বংস ঐসব লোকদের জন্য, যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে। অতঃপর বলে যে, এটি আল্লাহ্র নিকট থেকে সমাগত। যাতে তারা এর মাধ্যমে সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে। অতএব ধ্বংস হৌক তারা যা স্বহস্তে লেখে এবং ধ্বংস হৌক তারা যা উপার্জন করে' *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*।

১৬. সকলের পাঠযোগ্য : কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা আল্লাহ্র কালাম হিসাবে কেবল নবী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং উম্মতে মুহাম্মাদীর সবাই তা পাঠ করে ধন্য হ'তে পারে। মানুষ দুনিয়াতে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দেখতে পাবে না ঠিকই। কিন্তু তাঁর কালাম পাঠ করে ও শ্রবণ করে এক অনির্বচনীয় ভাবানুভূতিতে ডুবে যেতে পারে। ঠিক যেমন পিতার রেখে যাওয়া হস্তলিখিত পত্র বা লেখনী পাঠ করে প্রিয় সন্তান তার হারানো পিতার মহান স্মৃতিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই কুরআনের পাঠক ও অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীর চাইতে সৌভাগ্যবান জাতি পৃথিবীতে আর কেউ নেই। মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ কথা বলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তওরাত সে কথার সমষ্টি নয়। তাই বাইবেলের অনুসারীরা আল্লাহ্র সরাসরি কালাম থেকে বঞ্চিত। আর বর্তমান বাইবেল তো আদৌ প্রকৃত তওরাত নয়। অন্যদিকে হিন্দুদের বেদ তো কেবল ব্রাহ্মণদেরই পাঠের অনুমতি রয়েছে, সাধারণ হিন্দুদের নেই।

১৭. স্মৃতিতে সুরক্ষিত : কুরআন একমাত্র ইলাহী কিতাব, যা মানুষের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়েছে। কুরআনের পূর্বে কোন এলাহী গ্রন্থ মুখস্থ করা হয়নি। কুরআন আল্লাহ কর্তৃক হেফাযতের এটি একটি বড় প্রমাণ। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে শহরে-গ্রামে, এমনকি নির্জন কারা কক্ষে বসে অগণিত হাফেযে কুরআনের মুখে সর্বদা কুরআন উচ্চারিত হচ্ছে। অন্যেরা সবাই পুরা কুরআনের হাফেয না হ'লেও এমন কোন মুসলমান দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে, কুরআনের কিছু অংশ যার মুখস্থ নেই। ২০০৫ সালের একটি হিসাবে জানা যায় যে, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুঝুঁকির মধ্যে বসবাসকারী ফিলিস্তীনীদের মধ্যে চল্লিশ হাযার কিশোর-কিশোরী সে বছর কুরআনের হাফেয হয়েছে। *আলহামদুলিল্লাহ*।

১৮. সহজে মুখস্থ হবার যোগ্য : কুরআন এমনই গ্রন্থ যা সহজে মুখস্থ হয়ে যায়। একটু চেষ্টা করলেই তা মানুষের স্মৃতিতে গেঁথে যায়। মাতৃভাষা বাংলায় একশ' পৃষ্ঠার একটা গদ্য বা পদ্যের বই হুবহু কেউ মুখস্থ করতে পারবে কি-না সন্দেহ। অথচ ছয়শোর অধিক পৃষ্ঠার পুরো কুরআন মুখস্থকারী বাংলাভাষীর সংখ্যা নিঃসন্দেহে লাখ লাখ হবে।

ইহুদী, নাছারা, ফার্সী, হিন্দু, বৌদ্ধ কেউ কি একথা দাবী করতে পারবে যে, তাদের কেউ তাদের ধর্মগ্রন্থ আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পারে? এ দাবী কেবল মুসলমানরাই করতে

২১. *রহমাতুল্লিল আলামীন ৩/২৭৩*।

পারে। আর কেউ নয়। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* কুরআনকে হেফাযতের জন্য প্রদত্ত আল্লাহ্‌র ওয়াদার এটাও একটি জীবন্ত দলীল।

১৯. সর্বাধিক পঠিত ইলাহী গ্রন্থ : কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত ও প্রচারিত ইলাহী গ্রন্থ। আল্লাহ বলেন, وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ، فِيْ رَقٍّ مَنْشُوْرٍ 'কসম ঐ কেতাবের যা লিখিত হয়েছে' 'বিস্তৃত পত্রে' *(তূর ৫২/২-৩)*। এখানে কুরআন মজীদের তিনটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে- 'কিতাব' (গ্রন্থ), 'মাসতূর' (লিখিত) এবং 'মানশূর' অর্থাৎ বিস্তৃত। বস্তুতঃ কুরআন সর্বাধিক বিস্তৃত গ্রন্থ এ কারণে যে, তা মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। কুরআন প্রচারের জন্য কোন প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া অপরিহার্য নয়। যেকোন মুমিন কুরআন মুখস্থ করে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারে। ফলে যতদিন পৃথিবীতে মুসলমান থাকবে, ততদিন পৃথিবীতে কুরআন থাকবে ইনশাআল্লাহ।

২০. সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ : কুরআন এমনই একটি গ্রন্থ, যার প্রতিটি কথাই চূড়ান্ত সত্য ও ন্যায়পূর্ণ। পরিস্থিতির কারণে যে সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 'তোমার প্রভুর কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর কালামের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১১৫)*।

বাতিলপন্থীরা চিরকাল সত্যকে ভয় পায়। তাই মক্কার মুশরিক নেতারা কুরআন সত্য বলে স্বীকার করার পরেও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে কুরআন পরিবর্তনের দাবী করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَـــذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحَى إِلَيَّ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-

'আর যখন তাদের সামনে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, যা অতি স্পষ্ট, তখন ঐসব লোক যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না, তারা বলে, এটা ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে আসুন অথবা এতেই কিছু পরিবর্তন করে দিন। আপনি বলুন! নিজের পক্ষ থেকে এতে পরিবর্তন করার সাধ্য আমার নেই। আমি তো কেবল সেটারই অনুসরণ করি, যা আমার নিকট অহি করা হয়। আমি যদি আমার পালনকর্তার অবাধ্যতা করি, তাহ'লে আমি ভয়ংকর দিনের শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*।

২১. চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী : মানুষ যত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক, তা যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। কারণ সে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখে না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাই তাঁর বিধান অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত। মানুষ যতদিন আল্লাহ্‌র বিধান মতে চলবে, ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে। বস্তুতঃ কোন ধর্মগ্রন্থই নিজেকে إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ 'নিশ্চয়ই এটি সিদ্ধান্তকারী কথা' *(তারেক ৮৬/১৩)* বলে ঘোষণা দেয়নি। এটা কেবল কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য। কেননা কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র সর্বশেষ প্রেরিত কিতাব।

২২. ব্যাপক অর্থবোধক গ্রন্থ : কুরআনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর কোন আয়াত কোন বিশেষ উপলক্ষে নাযিল হ'লেও তার অর্থ হয় ব্যাপক। যাতে সকল মানুষ সকল যুগে এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও উপকৃত হয়। যেমন (১) সূরা 'আলাক্ব'-এর ৬ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মক্কার মুশরিক নেতা আবু জাহ্‌ল সম্পর্কে নাযিল হ'লেও তার বক্তব্য সকল যুগের ইসলামদ্রোহী নেতাদের প্রতি ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। অমনিভাবে (২) সূরা আহক্বাফ ১৫ আয়াতটি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বিষয়ে নাযিল হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজার ব্যবসা নিয়ে সিরিয়া যান, তখন আবুবকর তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। এ বয়সকেই উক্ত আয়াতে بَلَغَ أَشُدَّهُ (শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে উপনীত হ'ল) বলা হয়েছে। উক্ত সফরে খ্রীষ্টান পাদ্রী তরুণ মুহাম্মাদ-কে শেষনবী হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী করলে আবুবকর তাঁর প্রতি আরো বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছরে পৌঁছে যায় এবং রাসূল (ছাঃ) তাঁর দু'বছর আগেই নবুঅত লাভ করেন, তখন তিনি আয়াতে বর্ণিত দো'আটি করেন, حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِي إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে শক্তি দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম সমূহ করতে পারি। তুমি আমার সন্তানদের সৎকর্মশীল কর। আমি তোমার দিকে ফিরে গেলাম (তওবা করলাম) এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম' *(আহক্বাফ*

৪৬/১৫)।

এই দো'আ কবুল করে আল্লাহ তাকে এমন তাওফীক দান করেন যে, ৯জন নির্যাতিত মুসলিম ক্রীতদাস খরিদ করে তিনি আযাদ করে দেন এবং তাঁর পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি ক্রমে সবাই মুসলমান হয়ে যান। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেবল আবুবকর (রাঃ)-কেই আল্লাহ এই সৌভাগ্য দান করেন *(কুরতুবী)*। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য হ'ল সকল মুসলমানকে এই নির্দেশনা দেওয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছর হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত এবং বিগত গোনাহ সমূহ হ'তে তওবা করা উচিত। তার সন্তানাদিকে দ্বীনদার ও সৎকর্মশীল করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। নির্দিষ্ট ও ব্যাপক অর্থবোধক এই দ্বৈত ভাবধারা কুরআনী ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির এক অনন্য দিক, যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই।

২৩. পূর্ববর্তী সকল ইলাহী কিতাবের সত্যায়নকারী : কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী সকল এলাহী কিতাবের সত্যায়ন করেছে এবং সেগুলির সুন্দর শিক্ষাসমূহের প্রশংসা করেছে। এজন্য কুরআনের একটি নাম হ'ল مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 'পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী' *(বাক্বারাহ ২/৯৭; আলে ইমরান ৩/৩, ৫০ প্রভৃতি)*।

২৪. জিন ও ইনসানকে চ্যালেঞ্জকারী : কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা জিন ও ইনসান উভয় জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনার জন্য এবং তারা যে ব্যর্থ হবে, সে কথাও আগাম বলে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا- 'আপনি বলে দিন, যদি মানব জাতি ও জিন জাতি একত্রিত হয়ে পরস্পরে সহযোগিতার মাধ্যমে কুরআনের ন্যায় একটি কিতাব নিয়ে আসতে চায়, তবে তারা তা পারবে না' *(ইসরা ১৭/৮৮)*। এমনকি তারা অনুরূপ একটি 'সূরা' *(বাক্বারাহ ২/২৩-২৪)* বা ১০টি আয়াতও *(হূদ ১১/১৩-১৪)* রচনা করতে পারবে না। অর্থাৎ একটিও নয়। এভাবে কুরআন মক্কায় মুশরিকদের চারবার *(ইউনুস ৩৮, হূদ ১৩, ইসরা ৮৮, ক্বাছাছ ৪৯)* এবং মদীনায় ইহুদী-নাছারাদের একবার *(বাক্বারাহ ২৩-২৪)* চালেঞ্জ করেছে। কিন্তু ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস কারু হয়নি।

২৫. বাতিল হ'তে নিরাপদ : কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সকল প্রকারের অসত্য ও 'বাতিল' হ'তে নিরাপদ। যেমন আল্লাহ বলেন, لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ- 'তার সম্মুখ বা পিছন দিয়ে বাতিল কখনোই প্রবেশ করে না। এটি মহাজ্ঞানী ও মহা প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪২)*। কুরআনের শত্রুরা এতে একটি বর্ণও ঢুকাতে পারেনি বা বের করতে পারেনি। কুরআন তাই এক জীবন্ত মু'জেযা, যা পৃথিবীর সকল বিদ্বানকে পরাজিত করেছে ও অবনমিত করেছে। যেমন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন,

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلاً، قُلْ آمِنُوْا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوْا إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً، وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا-

'আমরা সত্যসহ এ কুরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাযিল হয়েছে। আমরা তো আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপেই প্রেরণ করেছি'। 'আমরা কুরআনকে খণ্ডাকারে নাযিল করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন এবং আমরা একে পরপর নাযিল করেছি'। 'আপনি বলুন তোমরা কুরআনকে বিশ্বাস কর বা অবিশ্বাস কর, যারা এর পূর্বে ইলমপ্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এটা তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নতমস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে'। 'এবং বলে যে, আমাদের পালনকর্তা মহা পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে'। 'তারা ক্রন্দন করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরো বৃদ্ধি পায়' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১০৫-১০৯)*।

২৬. কুরআন থেকে মুখ ফিরানোটাই অধঃপতনের কারণ : কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকেই উম্মতের অধঃপতনের কারণ বলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় পালনকর্তার নিকটে ওযর পেশ করে বলবেন, وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا- 'হে আমার পালনকর্তা! আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*।

২. হাদীছ : আরেক জীবন্ত মু'জেযা

আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'আমার রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর

এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى 'তিনি নিজ থেকে (দ্বীন বিষয়ে) কোন কথা বলেন না'। 'যা বলেন অহী করা হ'লেই তবে বলেন' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। সেকারণ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হেফাযতের দায়িত্বও আল্লাহ নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 'অতঃপর কুরআনের ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব আমাদেরই' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৯; নাহল ১৬/৬৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ... 'আর আমরা আপনার উপর কুরআন নাযিল করেছি সকল বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ'.. *(নাহল ১৬/৮৯)*। ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ بالسنة 'সুন্নাহ দ্বারা' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ সুন্নাহ সহ কুরআন সকল বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ।

কুরআন সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক বিধান সম্বলিত। সেকারণ তা সবার মুখস্থ ও মুতাওয়াতির। কিন্তু হাদীছ হ'ল বিস্তৃত ও শাখা-প্রশাখা সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত। তাই কেবল শ্রোতার নিকটেই তা মুখস্থ। শ্রোতার সংখ্যা একাধিক হ'লে ও সকল যুগে বহুল প্রচারিত হ'লে তা হয় মুতাওয়াতির। যা সব হাদীছের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কুচক্রীরা তাই সুযোগ নিয়েছিল জাল হাদীছ বানানোর। কিন্তু আল্লাহ সে চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে হেফাযত করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখের ন্যায় অনন্য প্রতিভা সৃষ্টি করে ছহীহ হাদীছগুলিকে পৃথক করে নিয়েছেন। ফলে জাল-যঈফের হামলা থেকে হাদীছ শাস্ত্র নিরাপদ হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোন নবী-রাসূলের বাণী ও কর্মের হেফাযতের জন্য এমন নিখুঁত ব্যবস্থাপনা কেউ কখনো দেখেনি বা শোনেনি।

জার্মান প্রাচ্যবিদ ডঃ স্প্রেংগার হাফেয ইবনু হাজারের গ্রন্থ রিভিউ করে তার পরিশিষ্টে বলেন, 'পৃথিবীতে এমন কোন জাতি অতীতে ছিল না এবং বর্তমানেও নেই, যারা মুসলমানদের ন্যায় রিজাল শাস্ত্রের অনুরূপ কোন শাস্ত্র সৃষ্টি করেছে। যার ফলে আজ পাঁচ লক্ষ জীবন চরিত সম্পর্কে জানা যায়'। অবশ্য মিশকাতের বঙ্গানুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী এই সংখ্যা ৮০ হাযারের বেশী হবে না বলেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে হেফাযতের জন্য বিরাট সংখ্যক মানুষের এই অতুলনীয় প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে তার জীবন্ত মো'জেযা হওয়ার অন্যতম দলীল।

ছেড়ে যাওয়া দুই অনির্বাণ আলোকস্তম্ভ :

বিদায় হজ্জের ভাষণসমূহের এক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি দু'টি বস্তু। যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ'।[২২] তিনি বলেন, নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যান না। ছেড়ে যান ইলম'।[২৩] আর শেষনবী (ছাঃ)-এর ছেড়ে যাওয়া সেই ইলম হ'ল কুরআন ও হাদীছ। দীনার ও দিরহামের ক্ষয় আছে, লয় আছে। কিন্তু ইলমের কোন ক্ষয় নেই লয় নেই। ইলম চির জীবন্ত। যে ঘরে হাদীছের পঠন-পাঠন হয়, সে ঘরে যেন স্বয়ং নবী কথা বলেন। যিনি হাদীছ বর্ণনা করেন, স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী তার মুখ দিয়ে বের হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হাদীছ বলার সময় ভয়ে বারবার সংজ্ঞা হারাতেন।[২৪] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) *ক্বালা রাসূলুল্লাহ* বলতে গিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠতেন ও কথা বন্ধ হয়ে যেত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলতেন, *ক্বালা রাসূলুল্লাহ* বলার আগে ভয় কর যে (মিথা বলার দায়ে) তোমাদের উপরে আল্লাহ্র গযব পতিত হবে, অথবা যমীন বিদীর্ণ হবে, আর তোমরা তাতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[২৫]

যিনি হাদীছ অনুযায়ী আমল করেন, তিনি স্বয়ং নবীর আনুগত্য করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হাদীছকে অগ্রাহ্য করে, সে স্বয়ং নবীকে অগ্রাহ্য করে। আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'অতএব যারা রাসূল-এর আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করবে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, (দুনিয়াতে) ফিৎনা তাদেরকে গ্রেফতার করবে এবং (আখেরাতে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। শুধু তাই নয় তার সমস্ত আমল আল্লাহ্র নিকটে বাতিল বলে গণ্য হবে *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জগদ্বাসীকে জান্নাতের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হলেন মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড'।[২৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'জেনে রেখ, আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু (অর্থাৎ হাদীছ)।[২৭]

অতএব কুরআন ও হাদীছ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া দুই অনন্য উত্তরাধিকার, দুই জীবন্ত মু'জেযা। যা মানবজাতির

---

২২. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬।*
২৩. *আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১২।*
২৪. *সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী, কুরআন বুঝার উপায়, ইফাবা পৃঃ ১৩৪।*
২৫. *কুরআন বুঝার উপায়, পৃঃ ১২৪।*
২৬. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪।*
২৭. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩।*

মুক্তির দিশা। অতএব সর্বাবস্থায় সেদিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

রাসূল চরিত পর্যালোচনা

সাধারণতঃ লোকেরা নবী-রাসূলগণকে ধর্মনেতা হিসাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। যারা দুনিয়াদারী থেকে সর্বদা দূরে থাকেন। আসলে ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। বরং তাঁরা মানুষকে তার সার্বিক জীবনে শয়তানের দাসত্ব হ'তে মুক্ত করে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে নিতে সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বিভিন্ন যুগে নবী-রসূলগণ যে নির্যাতিত হয়েছেন, তা মূলতঃ তাদের আনীত ধর্ম বিশ্বাসের সাথে প্রচলিত বিশ্বাস ও রীতি-নীতি সমূহের বিরোধ হওয়ার কারণে। তবে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ফেরাউনের সংঘর্ষ ধর্মবিশ্বাসগত হওয়া ছাড়াও নির্যাতিত বনু ইস্রাঈলদের মুক্তির মত রাজনৈতিক বিষয়টিও জড়িত ছিল। কেননা বনু ইস্রাঈলকে ফেরাউনের গোত্র ক্বিবতীরা দাস-দাসী হিসাবে ব্যবহার করত এবং তাদের উপরে অমানুষিক নির্যাতন করত। হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের আদি বাসস্থান শামে ফেরৎ আনতে চেয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের মধ্যে রাজনীতির নামগন্ধ না থাকলেও সমসাময়িক রাজা তাঁর জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তাঁকে হত্যা করার প্রয়াস চালায়। তাছাড়া তাওরাতের কিছু বিধান পরিবর্তন করায় ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘোর দুশমন ছিল। মূলতঃ তাদের চক্রান্তেই রাজা ক্ষিপ্ত হন। ফলে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে আসমানে জীবিত উঠিয়ে নেন।

পক্ষান্তরে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন মানবজাতির জন্য উসওয়ায়ে হাসানাহ বা 'সর্বোত্তম নমুনা' হিসাবে *(আহযাব ৩৩/২১)*। সেকারণ মানবজীবনে প্রয়োজনীয় কল্যাণময় সকল বিষয়ে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেন। ফলে তিনি একাধারে ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজনেতা, অর্থনৈতিক বিধানদাতা, সমরনেতা, বিচার বিভাগীয় নীতি ও দর্শনদাতা- এক কথায় বিশ্ব পরিচালনার সার্বিক পথপ্রদর্শক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিগত সকল নবী থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি তাহাজ্জুদগোযার রাসূলকে পাবেন শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে। একজন রাজনীতিক তার পথ খুঁজে পাবেন মদীনার সনদ, হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ী রাসূলের কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে। একজন অকুতোভয় সেনাপতি তার আদর্শ দেখতে পাবেন বদর-খন্দক-তাবুক বিজেতা সেনাপতি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে। একজন সমাজনেতা তার আদর্শ খুঁজে পাবেন জাহেলী আরবের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে আলোকময় মদীনা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সমাজনেতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে। একজন বিচারক তার আদর্শ খুঁজে পাবেন আল্লাহ্র দণ্ডবিধি কার্যকর করণে দৃঢ়চিত্ত নিরপেক্ষ বিচারক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে।

এমনিভাবে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে একজন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষ হিসাবে তাঁকে আমরা দেখতে পাই। অতএব জীবনের কোন একটি বা দু'টি বিভাগে রাসূল (ছাঃ)-কে আদর্শ মেনে অন্য বিভাগে অন্য কোন মানুষকে আদর্শ মানলে পূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন চরিত তাই একজন কল্যাণকামী সমাজনেতার জন্য আদর্শ জীবনচরিত। যা যুগে যুগে মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের আলোকস্তম্ভ রূপে পথ দেখাবে। মযলূম মানবতাকে যালেমদের হাত থেকে মুক্তির দিশা দিবে।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) অস্ত্র নিয়ে ময়দানে আসেননি। তিনি মানুষের ঘুণে ধরা বিশ্বাসে পরিবর্তন এনেছিলেন। আর তাতেই সৃষ্টি হয়েছিল সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লব। দুনিয়াপূজারী মানুষকে তিনি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ভিত্তিতে তিনি সমাজের আমূল পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। আজও যদি সেই দৃঢ় বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায়, তাহ'লে আবারো সেই হারানো মানবতা ও হারানো ইসলামী খেলাফত ফিরে পাওয়া সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন একদল যিন্দাদিল ঈমানদার মানুষ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!

॥ সমাপ্ত ॥

৪/১০/২০০৭ মোতাবেক ২১শে রামাযান ১৪২৮ হিজরী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বগুড়া যেলা কারাগারের কিশোর ওয়ার্ডের নির্জন টিনশেড কক্ষে বসে যেদিন বাউণ্ড বুক খাতায় শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনীর উপরে ১২১০ পৃষ্ঠার অত্র লেখাটি শেষ করি, সেদিন প্রাণভরে আল্লাহ্র কাছে যে দো'আ করেছিলাম, আজ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবার দ্বারপ্রান্তে একই প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে তুমি আমাকে তোমার প্রিয়নবীর শাফা'আত লাভে ধন্য কর এবং আমার ও আমার মরহূম পিতা-মাতার গোনাহ-খাতা মাফ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে তোমার দর্শন লাভে ধন্য কর এবং আমার সৎকর্মশীল মহান পূর্বসুরী ও উত্তরসুরীদের সাথে জান্নাতুল ফেরদৌসে একত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য দান কর- আমীন!!

ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের কর্তব্য

*মূল : আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বাদর**
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম বিন কাওছার***

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা হিজরী সাল অনুযায়ী বর্তমানে চতুর্দশ শতাব্দীতে অবস্থান করছি। ছাহাবীগণের মাঝে এবং আমাদের মাঝে অনেকগুলি শতাব্দী গত হয়ে গেছে। নবী করীম (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর থেকেই তারা তাঁর সাথে ছিলেন। সর্বদা তারা তাঁকে সঙ্গ দিতেন এবং তাঁকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। সুতরাং মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে আমাদের কি কোন তুলনা চলে?

তাঁরা ঈমান আনয়ন, দ্বীনের সহযোগিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদেরকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভের সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তাঁদেরকে যে সম্মানিত করেছেন, সেক্ষেত্রেও তাঁরা আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন।

অতএব আপনি তাঁদের জন্য দো'আ করার সময় তাঁদের অগ্রবর্তিতার কথা স্মরণ করবেন। আয়াতে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ 'তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন' *(হাশর ১০)*।

এই অগ্রবর্তিতার কারণে আপনার প্রতি তাঁদের অধিকার রয়েছে। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উপলব্ধির উদ্দেশ্যে আপনি তাঁদের অগ্রবর্তিতার কথা স্মরণ করুন। কারণ এই অগ্রবর্তিতার কারণে আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

যাহোক ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে হৃদয়কে নিষ্কলুষ রাখার অপরিহার্যতা হ'ল প্রথম বিষয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের ক্ষেত্রে জিহ্বাকে মুক্ত রাখতে হবে। গালি-গালাজ, অশ্লীল কথা-বার্তা, অভিশাপ, নিন্দা ইত্যাদি চিরতরে বন্ধ করতে হবে। পক্ষান্তরে তাঁদের জন্য শুধু প্রাণখোলা দো'আ করতে হবে। যেমনটি সূরা হাশরের ১০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মুমিনগণ কি তাঁদেরকে গালি দিবে? তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করবে? তাঁরা কি তাঁদেরকে নিন্দা করবে? তাঁদের মান-সম্মানে আঘাত করবে? কখনই না, আদৌ এমনটি কোন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে না। সেজন্য ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে ঈমানদারগণের ভূমিকা আমরা আবারও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই :

১. হৃদয়কে কলুষমুক্ত করতে হবে।

২. জিহ্বাকে গালি-গালাজ, নিন্দা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে হবে। সত্যিই ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন হৃদয় এবং মার্জিত যবান।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মর্যাদা এবং তাঁদেরকে গালি দেওয়ার নিষিদ্ধতা :

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে গালমন্দ করা থেকে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন এবং একই সঙ্গে তাদের উদ্দেশ্যে ছাহাবীগণের মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ– 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিও না। যার হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তথাপিও সে তাঁদের কোন একজনের পূর্ণ এক মুদ্দ[২৮] বা অর্ধ মুদ্দ দান সমপরিমাণও পৌঁছতে পারবে না'।[২৯]

কোন একজন ছাহাবী যদি একজন মিসকীনকে এক মুদ্দ পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দান করে আর আপনি এক ওহোদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করেন, তথাপিও আপনি ঐ ছাহাবীর এক মুদ্দ পরিমাণ দানের ধারে কাছেও যেতে পারবেন না। যদিও এটি সম্ভব নয় যে, আমাদের কারো ওহোদ পরিমাণ স্বর্ণ হবে এবং সে তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে। এত বেশী পরিমাণ সম্পদ যদি কারো হয়ও, তবুও হয়তো এই সম্পদ তার জন্য ফেৎনার কারণ হবে এবং সে কৃপণ হয়ে যাবে। ধরা যাক, আমাদের কারো ওহোদ পরিমাণ স্বর্ণ হ'ল এবং সে তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে একজন ছাহাবীর এক মুদ্দ খাদ্যদ্রব্য দানের নেকী পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। তাহ'লে আপনাকে বুঝতে হবে, ছাহাবীগণের সম্মান ও মর্যাদা কত বেশী।

'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিও না'- এ নির্দেশ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর। এটা সাধারণ কোন মানুষ বা আলেমের উক্তি নয়। এখানে তিনি তাঁর উম্মতকে নছীহত করেছেন এবং কোন ছাহাবীর সামান্যতম মানহানিকর কোন কাজ থেকে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। সাথে সাথে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কেও উম্মতকে সজাগ করেছেন।

রাসূল (ছাঃ) থেকে এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলিতে তিনি তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদা তুলে ধরেছেন। এমনকি কতিপয় আলেম ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মর্যাদা বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন; কিন্তু এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রশংসা সম্বলিত হাদীছ অনেক

** প্রফেসর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*
*** এম.এ (অধ্যয়নরত), ঐ।*

২৮. 'মুদ্দ' (مُــدّ) হ'ল এক 'ছা'-এর চার ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ চার মুদ্দে হয় এক 'ছা'। গ্রামের হিসাবে প্রায় ৬২৫ গ্রাম। -অনুবাদক।

২৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৪০।

বেশী হওয়ার কারণে এক খণ্ডে তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হননি। বরং কয়েক খণ্ডে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন পড়েছে।

লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ! কি মহান তাঁদের সম্মান! কি উঁচু তাঁদের মর্যাদা! তাঁদের প্রতি একজন মুসলিমের দায়িত্ব-কর্তব্যই না কত বড়!

মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জন্য দো'আ এবং ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ করেছেন এবং সত্যিকার মুমিনগণ তা বাস্তবায়নও করেছেন। কিন্তু কতিপয় লোক কুরআন ও হাদীছ নির্দেশিত এই পথ প্রত্যাখ্যান করে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে। ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে তারা তাঁদেরকে দিয়েছে গালি এবং প্রশংসার পরিবর্তে করেছে নিন্দা। ছহীহ মুসলিমে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ)-কে বলেন, يَا ابْنَ أُخْتِي أُمِرُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِأَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَسَبُّوْهُمْ– 'হে ভাগ্নে! ওদেরকে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তারা দিয়েছে গালি'।[৩০]

তবে এর পেছনে আল্লাহ্‌র বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ইবনুল আছীর (রহঃ) তাঁর প্রণীত 'জামেউল উছূল' (جامع الأصول) গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জাবের বিন আব্দুল্লাহ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কিছু মানুষ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), এমনকি আবু বকর ও ওমর (রা)-এরও নিন্দা-সমালোচনা করে থাকে, (তাদের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি)? তিনি বলেছিলেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের নেক আমল বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন, তাঁদের নেকীর পথ যেন বন্ধ না হয়ে যায়'।[৩১]

এটা কিভাবে সম্ভব? হাদীছ থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারি, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কারো নিন্দা-সমালোচনা করবে, ক্বিয়ামত দিবসে ঐ নিন্দাকারীর নেকী বিনা অপরাধে নিন্দিত ব্যক্তিটিকে দেওয়া হবে। হাদীছে এসেছে, একদা রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে বললেন,

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِىْ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِىْ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ–

'তোমরা কি জান, দরিদ্র কে?' তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে যার অর্থকড়ি নেই, সেই তো দরিদ্র। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি দরিদ্র, যে ক্বিয়ামত দিবসে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু সাথে এমন কিছু মানুষকে নিয়ে আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছিল, কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছিল, কারো রক্ত ঝরিয়েছিল, আবার কাউকে প্রহার করেছিল। অতঃপর তাদেরকে তার নেকী থেকে দেওয়া হবে। কিন্তু তার উপর চাপানো দেনাপাওনা শেষ হওয়ার আগেই যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে ঐ লোকগুলির পাপ নিয়ে তার আমলনামায় দেওয়া হবে। অবশেষে এক পর্যায়ে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে'।[৩২] জাহান্নামের আগুন থেকে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তি প্রার্থনা করি।

একজন সাধারণ মুসলিমকে গালি দেওয়ার ফল যদি এমন হয়, তাহ'লে যে ব্যক্তি ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে গালি দেয়, তার অবস্থা কি হবে?! ক্বিয়ামত দিবসে যখন তার নেকী ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে দিয়ে দেওয়া হবে, তখন কিরূপ ভয়াবহ হবে ঐ ব্যক্তির দশা? অতঃপর গালিদাতার নেকী শেষ হয়ে গেলে যাঁকে সে নিন্দা করেছে, তাঁর মন্দ আমল থেকে তাকে দেওয়া হবে। অতঃপর ঐ গালিদাতাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। যে ব্যক্তি ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে গালমন্দ করবে, বিপদাপদের কি ঘনঘটাই না নেমে আসবে তার পারলৌকিক জীবনে? আবুবকর (রাঃ) তার নেকী নিয়ে নিবেন, ওমর (রাঃ) তার নেকী নিয়ে নিবেন, ওছমান (রাঃ) তার নেকী নিয়ে নিবেন, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ তার নেকী নিয়ে নিবেন। এমনিভাবে অন্যান্য ছাহাবীও তার নেকী নিয়ে নিবেন।

আশ্চর্য হ'লেও সত্য যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)ও তাদের নিন্দা থেকে নিষ্কৃতি পাননি। অথচ ইফকের ঘটনায় যেনার অপবাদকারীদের অপবাদ থেকে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁকে নিষ্কলুষ ঘোষণা করেছেন এবং সূরা নূরে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াতও অবতীর্ণ করেছেন, যেগুলি ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে তেলাওয়াত করা হবে। এতদসত্ত্বেও আজও কিছু মানুষ তাঁকে নিন্দা করে থাকে; তাহ'লে ক্বিয়ামত দিবসে মা আয়েশা (রাঃ)-এর ভাগ্য কতইনা সুপ্রসন্ন হবে। তিনি বিরাট ছওয়াবের ভাগীদার হবেন। কিন্তু এই হতভাগা নিন্দাকারী ক্বিয়ামতের দিন নিঃস্ব হয়ে উঠবে। কারণ সে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে গালি দেওয়ার মত ঘৃণ্য পথ বেছে নিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, কিছু লোক সকাল-সন্ধ্যা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে গালি দিয়ে

৩০. ছহীহ মুসলিম, হা/৩০২২।
৩১. ইবনুল আছীর, জামেউল উছূল, হা/৬৩৬৬। কিন্তু কোন্ মুহাদ্দিছ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তা ইবনুল আছীর উল্লেখ করেননি। তবে ইবনু আসাকির তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ তারীখু দিমাশ্ক্ব (৪৪/৩৮৭)-এ হাদীছটি সনদসহ উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে খত্বীব বাগদাদী তাঁর তারীখু বাগদাদ (৫/১৪৭)-এ হাদীছটি নিয়ে এসেছেন।
৩২. মুসলিম, হা/২৫৮১।

থাকে; ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের সময় এই হতভাগাদের দশা কি হবে!

এমনকি তাদের কারো কারো বাড়াবাড়ি এমন চরমসীমায় পৌঁছেছে যে, তারা আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর মত মহান ব্যক্তিত্বকে অশ্লীল ও অকথ্য ভাষায় গালি দিতেও পিছপা হয় না। তাদের গালির নোংরা ভাষা এরূপ : 'হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশ বংশের দুই মূর্তি, দুই আল্লাহদ্রোহী, দুই ক্বিবত্বী এবং দুই কন্যা আবু বকর ও ওমরের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর'। অথচ রাসূল (ছাঃ) মুমিন সম্পর্কে বলেন, 'নিন্দুক, অভিশাপকারী ও অশ্লীল বাক্যালাপকারী মুমিন নয়'।[৩৩] রাসূল (ছাঃ)-কে একদা বলা হয়েছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি মুশরিকদের উপর বদদো'আ করুন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'বদদো'আ ও অভিশাপকারী হিসাবে আমি প্রেরিত হইনি'।[৩৪] এতকিছুর পরেও এক শ্রেণীর লাঞ্ছিত মানুষ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে লা'নত করার জন্য বেছে নিয়েছে!

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের তুলনামূলক পার্থক্য :

আলী ইবনে আবু ত্বালেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আবু বকর ও ওমর নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পরিণত বয়সী সকল জান্নাতবাসীর সরদার'।[৩৫] অতএব নবী-রাসূলগণের পরে তাঁরা দু'জন যেমন জান্নাতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তেমনি দুনিয়াতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

ছহীহ বুখারীতে এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে কে বেশী উত্তম, তা বিশ্লেষণ করতাম। আমরা সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসাবে আবু বকর (রাঃ)-কে জানতাম, অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে, অতঃপর ওছমান বিন আফফান (রাঃ) কে।[৩৬] ছহীহ বুখারী ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি হাদীছ গ্রন্থে এসেছে, 'রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এমর্মে খবর পৌঁছলে তিনি তা অপসন্দ করতেন না'।[৩৭]

ছহীহ বুখারীতে এসেছে, মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়্যাহ বলেন, আমি আমার পিতা আলী ইবনু আবু ত্বালেব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাসূল (ছাঃ)-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আবু বকর। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, ওমর। আমি ভাবলাম, এবার হয়তো ওছমান (রাঃ)-এর নাম বলবেন। সেজন্য বললাম, তারপর কি আপনি! তিনি বললেন, আমি সাধারণ একজন মুসলিম বৈ আর কেউ নই।[৩৮]

ইবনু আবী আছেম প্রণীত 'আস-সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে এসেছে, আলী (রাঃ) বলেন, لاَ يَبْلُغُنِيْ عَنْ أَحَدٍ يُفَضِّلُنِيْ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلاَّ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِيْ– 'কারো পক্ষ থেকে যদি আমার কাছে এমর্মে খবর আসে যে, সে আমাকে আবু বকর ও ওমরের উপর প্রাধান্য দিচ্ছে, তাহ'লে আমি মিথ্যা অপবাদকারীর হদ্দ স্বরূপ তাকে বেত্রাঘাত করব'।[৩৯] এটা স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু ত্বালেব (রাঃ)-এর উক্তি।

আমাদেরকে জানতে হবে যে, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের তুলনামূলক তারতম্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা তাঁদের প্রতি আমাদের কর্তব্যেরই একটি অংশ। আর এই জ্ঞান থাকলে আমরা তাঁদের প্রত্যেককে তাঁর যথাযথ হক্ব প্রদান করতে পারব। মহান আল্লাহ বলেন, لاَ يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلاًّ وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ– 'তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা তাদের চেয়ে বেশী, যারা পরে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত' *(হাদীদ ১০)*।

এখানে 'আল-হুসনা' (الْحُسْنَى) অর্থ জান্নাত এবং 'আল-ফাতহ' (الْفَتْح) অর্থ মক্কা বিজয় বা হুদায়বিয়ার সন্ধি। আয়াতে বলা হ'ল, যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে গাছের নীচে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত করেছিলেন আর যাঁরা এ সন্ধির পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করেছিলেন, তাঁরা সবাই ঈমান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সমান নন। বরং উভয় গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; যদিও তাঁরা সবাই ছাহাবী, সবাই ঈমানদার এবং সবাই জান্নাতী।

বুঝা গেল, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মর্যাদার ক্ষেত্রে সবাই সমান নন। সেজন্য হুদায়বিয়ার দিনে গাছের নীচে বায়'আতকারী ছাহাবীগণ হ'লেন সর্বোত্তম। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীগণ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁদের সবার মধ্যে উত্তম হ'লেন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবী। রাসূল (ছাঃ) এক বৈঠকে ঐ দশজন ছাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমাদ প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)

---

৩৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৯৪৯; বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৩১২; তিরমিযী, হা/১৯৭৭; হাকেম, ১/১২। সবাই ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি বর্ণনার পর ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব। ইমাম হাকেম বলেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটি ছহীহ; হাফেয যাহাবী হাকেমের এই মতকে সমর্থন করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩১২।

৩৪. মুসলিম হা/২৫৯৯।

৩৫. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬০২; তিরমিযী, হা/৩৬৬৬; ইবনু মাজাহ, হা/৯৫। এই হাদীছটি আরো কয়েকজন ছাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং সবগুলি সনদের উপর ভিত্তি করে শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৮২৪।

৩৬. বুখারী হা/৩৬৫৫।

৩৭. ইবনু আবী 'আছেম, 'আস-সুন্নাহ', হা/৯৯৩; আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ, হা/৫৬০৪; ত্বাবারানী, মুসনাদুশ শামিইয়্যিন, হা/১৭৬৪। হাদীছের অতিরিক্ত এই অংশটুকু ছহীহ, শায়খ আলবানী 'যিলালুল জান্নাহ' গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন, হা/১১৯৩।

৩৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৭১।

৩৯. হা/১২১৯, ইমাম আহমাদ, ফাযায়েলুছ ছাহাবাহ পৃঃ ৪৯।

থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওছমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, ত্বালহা জান্নাতী, যুবায়ের জান্নাতী, আব্দুর রহমান বিন আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ জান্নাতী, সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল জান্নাতী এবং আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ জান্নাতী'।[৪০] উল্লিখিত দশজন ছাহাবীকে নবী করীম (ছাঃ) এক বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। তাঁরা ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করতেন অথচ জানতেন, তাঁরা নিশ্চিত জান্নাতে যাবেন। কি মহা সৌভাগ্যের অধিকারী তাঁরা! দুনিয়ার মাটিতে চলাফেরা করছেন, অথচ জানছেন যে, তাঁরা ক্বিয়ামত দিবসে নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী।

আবার এই দশজনের মধ্যে সর্বোত্তম হ'লেন চার খলীফা এবং চার খলীফার মধ্যে সর্বোত্তম হ'লেন আবু বকর ও ওমর (রাঃ)। কিন্তু সকল ছাহাবীর মধ্যে সর্বোত্তম হ'লেন আবু বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)।

আবু বকর (রাঃ)-এর সাহচর্যের কথা সরাসরি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِه لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا 'তখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বললেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' *(তওবা ৪০)*। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন ছাহাবীর সাহচর্যের কথা পবিত্র কুরআনে আসেনি। আবু বকর (রাঃ) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে যা-ই বলা হ'ত, তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা বিশ্বাস করে নিতেন। মি'রাজ থেকে ফিরে এসে নবী (ছাঃ) যখন মুশরিকদেরকে বললেন যে, রাতে তাঁকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনি 'বুরাক্ব'-এ চড়েছিলেন; তখন তারা তা বিশ্বাস করতে না পেরে আবু বকর (রাঃ)-এর নিকটে আসল এবং বলল, তোমার সঙ্গী কি বলছে জানো? সে এমন এমন বলছে...। আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'তিনি যদি একথা বলে থাকেন, তাহ'লে সত্যই বলেছেন'।[৪১] সেজন্য তাঁকে এই উম্মতের 'ছিদ্দীক্ব' বা সত্যবাদী বলা হয়। নবী (ছাঃ)-এর সবকিছুকে বিনা বাক্য ব্যয়ে বিশ্বাস করার মত এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে আর কেউ পৌঁছতে পারেনি। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِه أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ– 'আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের পালনকর্তার নিকট ছিদ্দীক্ব বলে বিবেচিত' *(হাদীদ ১৯)*। আয়াতে উল্লিখিত এই সম্মান এবং বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার যোগ্য সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব হ'লেন আবু বকর (রাঃ)।

নীচের ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। নবী করীম (ছাঃ) একদা আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর অনুপস্থিতিতে ঘটনাটি বর্ণনা করছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরূপঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত শেষে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর দিকে মুখ করে বসলেন। অতঃপর বললেন, (বনী ইসরাঈলের) এক ব্যক্তি একদিন এক গরুর পিঠে আরোহণ করল এবং তাকে প্রহার করল। গরুটি বলল, আমাদেরকে আরোহণ করার কাজে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং চাষাবাদের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন উপস্থিতগণ বলে উঠলেন, সুবহা-নাল্লাহ! গরু কথা বলে! এরপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি, আবু বকর এবং ওমর এটা বিশ্বাস করি। হাদীছটির বর্ণনাকারী বলেন, ঐদিন তাঁরা দু'জন অনুপস্থিত ছিলেন। (বনী ইসরাঈলের) আরেক ব্যক্তি ছাগল চরাচ্ছিল, এমতাবস্থায় বাঘ এসে একটি ছাগল নিয়ে গেল। লোকটি পিছু ধাওয়া করে বাঘের হাত থেকে ছাগলটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হ'ল। তখন বাঘটি বলল, এই লোক ছাগলটিকে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল? যেদিন আমি ছাড়া ওর আর কোন রাখাল থাকবে না, সেদিন ওকে কে রক্ষা করবে? উপস্থিতগণ বলে উঠলেন, সুবহা-নাল্লাহ! বাঘ কথা বলে! রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি, আবু বকর এবং ওমর এটা বিশ্বাস করি। বর্ণনাকারী বলছেন, ঐদিন তাঁরা দু'জন অনুপস্থিত ছিলেন।[৪২]

এখানে ছিদ্দীক্ব এবং তাঁর ঈমানী দৃঢ়তার বিষয়টি লক্ষণীয়। অনুরূপভাবে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর পূর্ণ হেদায়াতপ্রাপ্তির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর মর্যাদার উপর আলোচনা করতে যাই, তাহ'লে ২/১টি বক্তব্যে তা শেষ করা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ ব্যতীত যেহেতু আর কোন হক্ব মা'বূদ নেই, সেহেতু তাঁর সুন্দরতম নামসমূহ এবং সুমহান গুণাবলীর মাধ্যমে আমরা তাঁরই নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন কোন ছাহাবীর প্রতি অথবা অন্য কোন মুমিনের প্রতি আমাদের হৃদয় সমূহে সামান্যতম বিদ্বেষ না দেন। তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের যেসব ভাই ঈমানের সাথে গত হয়ে গেছেন, তাদেরকে যেন ক্ষমা করেন। আমরা আল্লাহ্র সুন্দরতম নামসমূহ ও সুমহান গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর নিকট আরো প্রার্থনা করি, তিনি যেন ক্বিয়ামত দিবসে নবী (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণের সাথে আমাদেরকে হাশর-নাশর করান। আরো প্রার্থনা করি, ক্বিয়ামত দিবসে তিনি যেন আমাদেরকে আবু বকর, ওমর, ওছমান, আলী এবং নবী (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের সাথে হাশর-নাশর করান। মহা সম্মান এবং

---

৪০. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৭৫; তিরমিযী, হা/৩৭৪৭; নাসাঈ, সুনানে কুবরা, হা/৮১৯৪। দু'জনই হাদীছটিকে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্র. ছহীহুল জামে' হা/৫০।

৪১. হাকেম, ৩/৬৫; আবু নু'আইম, 'মারিফাতুছ ছাহাবাহ', ১/৮২; বায়হাক্বী, 'দালায়েলুন নুবুওয়াহ', ২/৩৬১। তাঁরা সবাই আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং হাফেয যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। অনুরূপভাবে আলবানীও হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩০৬।

৪২. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৭১।

মর্যাদার অধিকারী সকল ছাহাবীর সাথে যেন তিনি আমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন হাশর-নাশর করান।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জীবনচরিত অধ্যয়নের প্রতি যত্নশীল হওয়ার নছীহত :

প্রিয় মুসলিম ভাই! আমাদের উচিত, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জীবনী, তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা করা। এক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ দিয়ে শুরু করতে হবে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ পড়তে হবে। ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, সুনানে আরবা'আহ, মাসানীদ, মা'আজিম[৪৩], আজ্যা ইত্যাদি হাদীছ গ্রন্থে উল্লিখিত আছার এবং ওলামায়ে কেরামের উক্তি পড়তে হবে। সাথে সাথে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ফযীলত বিষয়ে পৃথকভাবে প্রণীত গ্রন্থসমূহও পড়তে হবে। কারণ এই অধ্যয়ন থেকে আমরা অনেক উপকার লাভে ধন্য হব। তন্মধ্যে-

এক. ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জীবনী পড়লে তাঁদের প্রতি আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের প্রশংসা, তাঁদের জন্য দো'আ এবং ক্ষমা প্রার্থনার পথ প্রশস্ত হবে। তাঁদের সম্পর্কে সবসময় ভাল আলোচনার বিষয়টি সহজ হবে।

দুই. ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জীবনচরিত পড়লে তাঁদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের প্রতি আপনি যত্নশীল হ'তে পারবেন। আর আপনি জীবন চলার পথে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সাথে যতবেশী সাদৃশ্য বজায় রাখতে পারবেন, কল্যাণের ততবেশী কাছাকাছি থাকতে পারবেন। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে' *(আলে ইমরান ১১০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হ'লেন আমার যুগের মানুষ'।[৪৪] যেহেতু আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (ছাঃ) তাঁদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন, সেহেতু যতবেশী তাঁদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখা যাবে, ততবেশী কল্যাণের কাছাকাছি থাকা সম্ভব হবে।

তিন. ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে গালমন্দ করা, তাঁদেরকে নিন্দা-সমালোচনা করা ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাজ থেকে আপনি সর্বোচ্চ দূরত্বে অবস্থান করতে পারবেন। ছাহাবীগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের প্রশংসা করা, তাঁদেরকে সম্মান করা, তাঁদেরকে ভালবাসা এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার নির্দেশ আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আর তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন আপনাকে উপরোক্ত নির্দেশাবলী পালনে উৎসাহিত করে তুলবে।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মধ্যে বিবাদীয় বিষয়ে একজন মুসলিমের ভূমিকা :

আমাদের আলোচনার এটিই শেষ বিষয়। ছাহাবীগণের মধ্যে যেসব মতানৈক্য হয়েছে, তদ্বিষয়ে আমাদের করণীয় কি?

সালাফে ছালেহীনের এক ব্যক্তিকে যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, تِلْكَ فِتْنَةٌ طَهَّرَ اللهُ مِنْهَا سُيُوْفَنَا، فَلْنُطَهِّرْ مِنْهَا أَلْسِنَتَنَا- 'এটি ছিল একটি ফেৎনা। আল্লাহ তা থেকে আমাদের তরবারীকে মুক্ত রেখেছেন। অতএব, আমরা তাথেকে আমাদের যবানকেও মুক্ত রাখব'।[৪৫]

আরেকজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন, تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- 'তারা ছিল এক সম্প্রদায়, যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্য। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না' *(বাক্বারাহ ১৩৪)*।[৪৬]

মনে করুন, কোন একজন ছাহাবী ভুল করেছেন। কিন্তু আপনার তাতে মাথা ঘামানোর দরকারটা কি! ক্বিয়ামতের দিন কি আল্লাহ এই ভুলের জন্য আপনার কাছে হিসাব চাইবেন? আল্লাহ বলেন, 'তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না'। আপনি ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর পর্যবেক্ষক নন, তাহ'লে কেন আপনি তাঁদের মধ্যে বিবাদীয় বিষয়ে নিজেকে জড়াবেন। আল্লাহ বলেন, 'তারা ছিল এক সম্প্রদায়, যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্য। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না'।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, ধরে নিচ্ছি, একজন ছাহাবী ভুল করেছেন। কিন্তু তিনি এই ভুলটি ইচ্ছা করে করেননি; বরং ইজতিহাদ করতে গিয়ে ঘটে গেছে। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ- 'বিচারক যদি বিচার করতে গিয়ে ইজতিহাদ করেন এবং সঠিক বিচার করতে সক্ষম হন, তাহ'লে তাঁর জন্য রয়েছে দু'টি নেকী। পক্ষান্তরে যদি তিনি বিচার করতে গিয়ে ইজতিহাদ করেন, কিন্তু ভুল বিচার করে

৪৩. মা'আজিম (الْمَعَاجِمُ) মাসানীদের মত। তবে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য হ'ল, মা'আজিমে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর নামসমূহকে শুধুমাত্র আরবী বর্ণের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজানো হয় এবং কখনও কখনও একই বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর হাদীছ সমূহকে সর্বপ্রথম নিয়ে আসা হয়। কিন্তু মাসানীদে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে সাজানোর কয়েকটি ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।- অনুবাদক

৪৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫২, ৩৬৫১, ৬৪২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৩৩।

৪৫. ঘটনাটি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়। দ্রঃ হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৯/১১৪; আল-মুজালাসাহ/১৯৬৫। এখানে উক্তিটির শব্দগুলি এভাবে এসেছে, تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ يَدِي مِنْهَا، فَمَا لِي أُخَضِّبُ لِسَانِي فِيْهَا 'সেটি ছিল রক্তাক্ত ইতিহাস, আল্লাহ তাথেকে আমার হাতকে মুক্ত রেখেছেন। তাহ'লে এ বিষয়ে কথা বলে খামাখা কেন আমি আমার জিহ্বাকে রঞ্জিত করব?!'

৪৬. তিনি হ'লেন ইমাম আহমাদ। দ্রঃ খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, ২/৪৮১।

ফেলেন, তাহ'লে তার জন্য রয়েছে একটি নেকী'।[৪৭] সেজন্য ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে যেসব মতানৈক্য বা ভুলের কথা উল্লখ করা হয়, সেগুলির দু'টি অবস্থাঃ হয় সেগুলি তাঁদের উপর মিথ্যারোপ। আর তাঁদের সম্পর্কে উল্লিখিত বেশীর ভাগ মতানৈক্য বা ভুল এই শ্রেণীর।

আর নয়তো সেগুলি সঠিক। আর সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত এই ভুলগুলি সম্পর্কে আমরা বলব, তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন। যিনি ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল করেননি, তাঁর দুই নেকী। আর যিনি ভুল করেছেন, তাঁর এক নেকী এবং তাঁর গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

অতএব ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মধ্যে বিবাদীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা কারো উচিত নয়। তবে যদি কেউ তাঁদের পক্ষে লড়াই এবং তাঁদের সম্মান-মর্যাদা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এসব বিষয়ে কথা বলে, তাহ'লে কোন সমস্যা নেই।

পরিশেষে, আমি নিম্নোক্ত দো'আগুলির মাধ্যমে এই পুস্তিকাটির ইতি টানতে চাই-

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ-

'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমনিভাবে আপনি ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি মহা প্রশংসিত, মহা সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের উপর, যেমনিভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয়ই আপনি মহা প্রশংসিত, মহা সম্মানিত'।

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّيْنَ؛ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ، وَعُمَرَ الْفَارُوْقِ، وَعُثْمَانَ ذِيْ النُّوْرَيْنِ، وَأَبِيْ الْحَسَنَيْنِ عَلِيٍّ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ بَقِيَّةِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِيْنَ بِالْجَنَّةِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ زَوْجَاتِ نَبِيِّكَ، وَارْضَ اللهُمَّ عَنْ صَحَابَةِ نَبِيِّكَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا، عَنْ صَحَابَةِ نَبِيِّكَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ صَحَابَةِ نَبِيِّكَ أَجْمَعِيْنَ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَمَّنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ-

৪৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫২; মুসলিম, হা/১৭১৬।

'হে আল্লাহ! আপনি চার খলীফা আবু বকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর উপর সন্তুষ্ট হোন। হে আল্লাহ! জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্যে অবশিষ্ট ছয়জনের প্রতিও আপনি সন্তুষ্ট হোন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার নবী (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের উপর সন্তুষ্ট হোন। হে আল্লাহ! আপনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীগণের উপর সন্তুষ্ট হোন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার নবী (ছাঃ)-এর সকল ছাহাবীর উপর সন্তুষ্ট হোন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁদের পথের প্রকৃত অনুসারীদের উপর সন্তুষ্ট হোন'।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ আপনি রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় দয়ালু, পরম করুণাময়' *(হাশর ১০)*।

সবশেষে, মহান রব্বুল আলামীনের প্রশংসা করছি। আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল ছাহাবীর উপর দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন।[২১]

২১. এই পুস্তিকার বিষয়বস্তুটি মূলতঃ মদীনার মসজিদে কুবাতে উপস্থাপিত একটি বক্তব্য। ক্যাসেট থেকে বক্তব্যটি আলাদা করা হয়েছে এবং আমি এখানে কিছু সংশোধনীও এনেছি। তবে বক্তব্যটি বক্তব্য আকারে রেখে দেওয়াই ভাল মনে করেছি। মহান আল্লাহই একক তাওফীক্বদাতা (মূল লেখক)।

পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

পাত্র বিষয়ক মাসআালা

الآنية-এর পরিচিতি : যে পাত্রে পানি অথবা অন্য কোন খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় তাকে الآنية বলা হয়। এর আসল বা মূল হ'ল হালাল হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا 'তিনি যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৯)*। আর পাত্র আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব পাত্র যতক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র হওয়ার যথাযথ দলীল পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তা পবিত্র।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী পাত্রের ব্যবহার এবং তাতে রক্ষিত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের হুকুম :

স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী পাত্রে শুধুমাত্র খাওয়া ও পান করা হারাম। এছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

ইবনু আবি লায়লা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রাঃ)-এর সঙ্গে বাইরে বের হ'লাম। এ সময় তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা আলোচনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করবে না। আর মোটা বা পাতলা রেশম বস্ত্র পরিধান করবে না। কেননা এগুলো দুনিয়াতে তাদের (অমুসলিমদের) জন্য। আর তোমাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে।[৪৮] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রৌপ্যের পাত্রে পান করে সে তো তার উদরে জাহান্নামের অগ্নি প্রবিষ্ট করায়'।[৪৯]

উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র শুধুমাত্র খাওয়া এবং পান করার কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয। এসব পাত্রে রাখা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাও জায়েয। কেননা যদি অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার অবৈধ হ'ত তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে খাওয়া ও পান করতে নিষেধ করতেন না।[৫০]

কাফিরদের পাত্র ব্যবহার করার হুকুম :

যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, কাফিরদের ব্যবহারিক পাত্রে কোন অপবিত্র বস্তু তোলা হয়নি, তাহ'লে তা ব্যবহার করা হালাল। আর যদি জানা যায় যে, তাতে অপবিত্র বস্তু তোলা হয়েছে এবং সে পাত্র ছাড়া অন্য কোন পাত্র পাওয়া না যায়, তাহ'লে তা ভালভাবে ধৌত করে ব্যবহার করা জায়েয। হাদীছে এসেছে, আবু ছা'লাবা খুশানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বাস করি, তাদের পাত্রে আহার করি। আর আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি, শিকার করি তীর ধনুক দিয়ে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে এবং প্রশিক্ষণ বিহীন কুকুর দিয়েও। অতএব আমাকে বলে দিন, এর মধ্যে আমাদের জন্য কোন্‌টি হালাল? তিনি বললেন, তুমি উল্লেখ করেছ যে, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস কর, তাদের পাত্রে খানা খাও। তবে যদি তাদের পাত্র ব্যতীত অন্য পাত্র পাও, তাহ'লে তাদের পাত্রে আহার করো না। আর যদি না পাও, তাহ'লে ঐগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার করবে। আর তুমি উল্লেখ করেছ যে তুমি শিকারের অঞ্চলে থাক। তুমি যা তীর ধনুক দ্বারা শিকার কর, তাতে তুমি বিসমিল্লাহ পড়বে এবং তা খাবে। তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে যা শিকার কর, তাতে বিসমিল্লাহ পড়বে এবং তা খাবে। আর তুমি যদি প্রশিক্ষণ বিহীন কুকুর দ্বারা শিকার কর, সেক্ষেত্রে যদি যবেহ করা যায়, তাহ'লে খেতে পার'।[৫১]

পক্ষান্তরে যদি জানা না যায় যে, কাফিরদের পাত্রে কোন অপবিত্র বস্তু তোলা হয়েছে কি-না? তাহ'লে তা ব্যবহার করা জায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের একজন মুশরিক মহিলার মশক হ'তে পানি নিয়েছিলেন এবং তা পান করেছিলেন ও ওযূ করেছিলেন।[৫২]

** লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৪৮. বুখারী, 'স্বর্ণের পাত্রে পানি পান করা' অনুচ্ছেদ, হা/৫৬৩৩; বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৫/২৯৩।

৪৯. বুখারী, 'স্বর্ণের পাত্রে পানি পান করা' অনুচ্ছেদ, হা/৫৬৩৪; বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৫/২৯৩।

৫০. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মসতাকনে ১/৭৫; ফিক্বহুল মুয়াস্‌সার, পৃঃ ৬।

৫১. বুখারী, 'শিকার' অধ্যায়, হা/৫৪৮৮; বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৫/২৩০।

৫২. বুখারী, হা/৩৪৪; বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৭৪; ফিকহুল মুয়াস্‌সার, পৃঃ ৭।

মৃত পশুর চামড়া দ্বারা তৈরী পাত্র ব্যবহারের হুকুম :

যে পশুর গোশত খাওয়া হালাল সে পশু মৃত্যুবরণ করলে তার চামড়া লবণ বা অনুরূপ পদার্থ দ্বারা পাকা করলে তা পবিত্র হয় এবং তা ব্যবহার করা জায়েয। পক্ষান্তরে যে পশুর গোশত খাওয়া হারাম তার চামড়া পাকা করার মাধ্যমে পবিত্র হয় না এবং তা ব্যবহার করাও জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে চামড়া পাকা করা হয় তা পবিত্র'।[৫৩] অন্য হাদীছে এসেছে, মায়মূনা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক সময় মায়মূনার এক দাসীকে ছাদাক্বা হিসাবে একটি ছাগল দেওয়া হয়েছিল। একদিন সেটা মরে গেল (তা ফেলে দেওয়া হ'ল)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা এর চামড়া খুলে পাকা করে নিলে না কেন? তাহ'লে প্রয়োজনে ব্যবহার করে উপকৃত হ'তে পারতে। সবাই বলল, ওটা মরে গিয়েছিল তাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মরে গেলে তো তা খাওয়া হারাম' (কিন্তু তার চামড়া ব্যবহার করা তো হারাম নয়)।[৫৪]

অতএব যে পশুর গোশত খাওয়া হালাল, সে পশু মারা গেলে তার পাকাকৃত চামড়া দ্বারা তৈরী পাত্র ব্যবহার করা জায়েয। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া এবং মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেছেন।[৫৫]

পেশাব-পায়খানা সম্পর্কিত মাসআলা

ইসতিনজা তথা মল-মূত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জন :

মল-মূত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জনের দু'টি মাধ্যম রয়েছে। তা হ'ল-

১- ইসতিনজা : পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্রতা অর্জন করা।

২- ইসতিজমার : পবিত্র ঢিলা অথবা পাথর কিংবা অনুরূপ পবিত্র বস্তু দ্বারা মাসেহ করে পবিত্রতা অর্জন করা।

উল্লিখিত দু'টি মাধ্যমের যেকোন একটি দ্বারা মল-মূত্র ত্যাগের পরে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِّنْ مَّاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টয়লেটে প্রবেশ করতেন, তখন আমি ও আমার মত একজন গোলাম একটি চামড়ার তৈরী ছোট পাত্রে পানি ও একটি বর্শা বা বল্লম নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি পানি দ্বারা ইসতিনজা করতেন।[৫৬]

আর যদি কেহ ইসতিজমার তথা পাথর বা অনুরূপ কোন পবিত্র বস্তু যেমন- ঢিলা, টিস্যু, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে চায়, তাহ'লে সে যেন তিনবারের কম মাসেহ না করে।

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

সালমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাকে বলা হ'ল, তোমাদের নবী (ছাঃ) তোমাদেরকে সব কিছুই শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি পায়খানা করার নিয়মও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, পেশাব-পায়খানার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করতে, ডান হাত দ্বারা ইসতিনজা করতে, তিনটির কম পাথর (ঢিলা) দ্বারা ইসতিনজা করতে, গোবর অথবা হাড্ডি দ্বারা ইসতিনজা করতে।[৫৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যাবে, সে যেন তিনটি পাথর নিয়ে যায়। সে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আর এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[৫৮]

পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসার হুকুম :

খোলা মাঠে পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ ফিরে বসা জায়েয নয়।

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوْا، أَوْ غَرِّبُوْا قَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى.

৫৩. মুসলিম, হা/৩৬৬; তিরমিযী, হা/১৬৫০।
৫৪. মুসলিম, হা/৩৬৩; ইবনু মাজাহ, হা/৩৬১০।
৫৫. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/১০৩; শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি, ১/৯২।

৫৬. মুসলিম, হা/২৭১।
৫৭. মুসলিম, হা/২৬২।
৫৮. আবু দাউদ, 'পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা' অনুচ্ছেদ, হা/৪০।

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে'। আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা ইসতিগফার করতাম।[৫৯]

যেহেতু মদীনাবাসীদের ক্বিবলাহ দক্ষিণে, সেহেতু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ না করে পূর্ব এবং পশ্চিমে মুখ অথবা পিঠ ফিরে পেশাব-পায়খানা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের ক্বিবলাহ যেহেতু পশ্চিম দিকে সেহেতু খোলা মাঠে পেশাব-পায়খানা করার সময় উত্তর ও দক্ষিণে মুখ অথবা পিঠ ফিরে বসতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি ঘরের মধ্যে পেশাব-পায়খানা করে অথবা ক্বিবলার দিকে কোন দেয়াল থাকে তাহ'লে ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ ফিরে পেশাব-পায়খানা করা জায়েয।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে হাফছাহ (রাঃ)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শামের দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করতে (পেশাব-পায়খানা) বসেছেন।[৬০] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ.

মারওয়ান আল-আছফার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে তাঁর উষ্ট্রীর উপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বসে পেশাব করতে লাগলেন। তখন আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! এই ব্যাপারে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে, তবে তা খোলা জায়গায়। অতএব তোমার মাঝে এবং ক্বিবলার মাঝে যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আড়াল করবে, তাহ'লে কোন অসুবিধা নেই।[৬১]

টয়লেটে প্রবেশকারীর জন্য সুন্নাত কাজ সমূহ :

(ক) বিসমিল্লাহ বলে টয়লেটে প্রবেশ করা :

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيْفَ أَنْ يَّقُوْلَ : بِسْمِ اللهِ. 'আদম সন্তানের লজ্জাস্থান এবং জিনের মাঝে পর্দা হ'ল যখন সে টয়লেটে প্রবেশ করবে, তখন বলবে 'বিসমিল্লাহ'।[৬২]

(খ) টয়লেটে প্রবেশের দো'আ পাঠ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও নারী শয়তানদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৬৩]

অতএব টয়লেটে প্রবেশের দো'আ হ'ল, بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ 'আল্লাহর নামে টয়লেটে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও নারী শয়তানদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(গ) টয়লেট থেকে বের হয়ে দো'আ পাঠ করা :

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানা হ'তে বের হ'তেন তখন বলতেন, غُفْرَانَكَ 'তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[৬৪]

(ঘ) নিতম্ব মাটির নিকটবর্তী করার পরে কাপড় উত্তোলন করা :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন (পেশাব-পায়খানার) প্রয়োজন মেটানোর ইচ্ছা করতেন, তখন

৫৯. *বুখারী, 'মদীনাহ, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের ক্বিবলাহ' অনুচ্ছেদ, হা/৩৯৪; বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/২০৩।*

৬০. *বুখারী, 'গৃহের মধ্যে পেশাব পায়খানা করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৪৮; বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৯১।*

৬১. *আবু দাউদ, হা/১১, দারাকুতনী, হা/১৫৮, ইবনে হাজান এবং নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৬১।*

৬২. *ইবনু মাজাহ, হা/২৯৭; তিরমিযী, হা/৬০৬; নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর, হা/৩৬১১।*

৬৩. *বুখারী, 'পায়খানায় প্রবেশের দো'আ' অনুচ্ছেদ, হা/৬৩২২, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৫/৫৮৮।*

৬৪. *আবূদাউদ, হা/১৭, তিরমিযী, হা/৭, নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দ্রঃ ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর, হা/৪৭০৭।*

তিনি মাটির নিকটবর্তী না হয়ে কাপড় উত্তোলন করতেন না।[৬৫]

(ঙ) টয়লেটে প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং ডান পা দিয়ে বের হওয়া। এর দ্বারা বাম দিকের চেয়ে ডান দিকের ফযীলত বৃদ্ধি করা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান দিকের ফযীলত বেশী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে বলেছেন এবং বাম পা দিয়ে বের হ'তে বলেছেন। জুতা পরিধান করার সময় ডান পা দিয়ে শুরু করতে বলেছেন এবং খোলার সময় বাম পা দিয়ে শুরু করতে বলেছেন। অনুরূপভাবে টয়লেটে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হ'তে হবে। কেননা টয়লেটের ভেতরের চেয়ে বাহির উত্তম।[৬৬]

পেশাব-পায়খানাকারীর উপর হারাম কাজ সমূহ :

(ক) আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা :

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন, 'নিশ্চয়ই তিনি বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন'।[৬৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং জানাবাতের অবস্থায় গোসল না করে'।[৬৮]

(খ) পেশাব করার সময় ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা :

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِه، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِه.

আবু কাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন শৌচাগারে যায়, তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে'।[৬৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِه، وَلاَ يَسْتَنْجِيْ بِيَمِيْنِه، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ.

আবু কাতাদাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে এবং পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে'।[৭০]

(গ) রাস্তায়, গাছের ছায়ায়, বাগানে ফলবতী গাছের নীচে এবং পানির হাউজে পেশাব-পায়খানা করা :

عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ : الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَالظِّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ.

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অভিশপ্ত তিন ব্যক্তি হ'তে তোমরা বেঁচে থাক। পানির স্থানে মল ত্যাগকারী, ছায়ায় এবং রাস্তার মাঝখানে মল ত্যাগকারী'।[৭১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلَّى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِى ظِلِّهِمْ.

'তোমরা অভিশপ্ত দুই ব্যক্তি হ'তে বেঁচে থাক'। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অভিশপ্ত দুই ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি লোকজনের চলাচলের রাস্তায় এবং তাদের ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করে'।[৭২]

(ঘ) পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা অথবা কুরআন নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা : কুরআন আল্লাহ্র কালাম বা কথা, যা অন্যান্য সকল কালাম অপেক্ষা ফযীলতপূর্ণ ও সম্মানিত।

(ঙ) হাড্ডি, গোবর এবং খাদ্য দ্বারা কুলুক করা :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর ওযূ ও ইস্তিন্জার ব্যবহারের জন্য পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে পিছনে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাকিয়ে বললেন, কে? আমি বললাম, আমি আবু হুরায়রাহ। তিনি বললেন, আমাকে কয়েকটি পাথর তালাশ করে দাও। আমি তা দিয়ে ইস্তিন্জা করব। তবে হাড্ডি ও গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় কয়েকটি পাথর এনে তাঁর কাছে রেখে দিলাম এবং আমি সেখান থেকে কিছুটা দূরে গেলাম। তিনি যখন ইস্তিন্জা হ'তে বের হ'লেন, তখন আমি এগিয়ে তাঁকে

৬৫. আবুদাঊদ, হা/১৪, তিরমিযী, হা/১৪, নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর, হা/৪৬৫২।

৬৬. শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনে ১/১০৮; ফিক্বহুল মুয়াস্সার, পৃঃ ১০।

৬৭. মুসলিম, হা/২৮১; বুখারী, 'আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৩৯।

৬৮. আবুদাঊদ, 'আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা' অনুচ্ছেদ, হা/৭০।

৬৯. বুখারী, 'ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ, হা/১৫৩; বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৮৬।

৭০. বুখারী, 'ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ, হা/১৫৪; বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৮৭।

৭১. আবু দাঊদ, হা/২৬, ইবনু মাজাহ, হা/৩২৮, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল, ১/১০০।

৭২. মুসলিম, 'রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ, হা/২৬৯।

জিজ্ঞেস করলাম, হাড্ডি ও গোবরের ব্যাপার কি? তিনি বললেন, এগুলো জিনের খাবার। আমার কাছে নাছীবীন নামক জায়গা হ'তে জিনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। তারা ভাল জিন ছিল। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্যের আবেদন জানাল। তখন আমি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলাম যে, যখন কোন হাড্ডি বা গোবর তারা লাভ করে তখন তারা যেন তাতে খাদ্য পায়।[৭৩]

অত্র হাদীছ হ'তে জানা যায় যে, পাথর বা তার বিকল্প জিনিস যথা- ঢিলা, টিস্যু, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে ইস্তিন্জা করা বৈধ। অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ.

আবু যুবাইর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি জাবের (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন হাড্ডি ও গোবর দ্বারা ইস্তিন্জা করতে'।[৭৪]

(চ) মুসলমানদের কবরে এবং বাজারের মধ্যে পেশাব-পায়খানা করা :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيْ بِرِجْلِيْ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِيْ أَوَسْطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ، أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ.

উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানের কবরের উপর দিয়ে আমার হেঁটে যাওয়া অপেক্ষা জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে অথবা তরবারির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অথবা আমার জুতাজোড়া আমার পায়ের সাথে সেলাই করা আমার নিকট অধিক প্রিয়। কবরস্থানে পায়খানা করা এবং বাজারের মাঝখানে পায়খানা করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না'।[৭৫]

পেশাব-পায়খানাকারীর জন্য মাকরূহ বা অপসন্দনীয় কাজ সমূহ :

(ক) খোলা জায়গায় প্রবাহিত বাতাসের বিপরীত মুখে পেশাব করতে বসা : কেননা তাতে পেশাব শরীরে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় সালাম ও উত্তর দেওয়া :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُوْلُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি পথ চলছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব করছিলেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন উত্তর দিলেন না'।[৭৬]

(গ) কোন ছিদ্র বা গর্তে পেশাব করা :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَالَ فِى الْجُحْرِ. قَالَ قَالُوْا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তারা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করল, গর্তে পেশাব করা অপসন্দের কারণ কি? তিনি বললেন, বলা হয়ে থাকে এটা জিনদের আবাস স্থল।[৭৭] অতএব জিন অথবা অন্য কোন প্রাণীর আবাসস্থল হ'লে তারা কষ্ট পাবে।

(ঘ) কোন যরূরী প্রয়োজন ছাড়া এমন কিছু নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা মাকরূহ বা অপসন্দনীয় যাতে আল্লাহ্র নাম লিখা আছে। কেননা তাতে আল্লাহ নামের অসম্মান করা হয়।

পক্ষান্তরে যদি যরূরী প্রয়োজনে কেউ আল্লাহর নাম লিখা আছে এমন জিনিস নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করে তাহ'লে তাতে কোন সমস্যা নেই। যেমন- টাকার উপরে যদি আল্লাহ্র নাম লিখা থাকে, তাহ'লে তা নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করলে কোন সমস্যা নেই। কেননা তা বাইরে রেখে প্রবেশ করলে হারিয়ে যাওয়ার অথবা ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকে। তবে কুরআন নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, হারিয়ে যাওয়ার বা ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকুক বা নাই থাকুক তা হারাম। *[চলবে]*

---

৭৩. *বুখারী, 'জিনদের উল্লেখ' অনুচ্ছেদ, হা/৩৮৬০; বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৩/৬১৭।*

৭৪. *মুসলিম, হা/২৬৩।*

৭৫. *ইবনু মাজাহ, হা/১৫৬৭, নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ১/১০২।*

৭৬. *মুসলিম, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ, হা/৩৭০।*

৭৭. *আবু দাউদ, হা/২৯, নাসাঈ, হা/৩৪; হাফেয ইবনে হাজার হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ তালখীছুল হাবীর ১/১০৬।*

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(৩য় কিস্তি)

পাশ্চাত্যে মানবাধিকারের ধারণা :

ইউরোপীয় দেশ সমূহ : পাশ্চাত্যে মানবাধিকারের ধারণাটি অতি প্রাচীন ও অস্পষ্ট। মানবাধিকারের বিষয়ে প্রাচীন গ্রীকের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেখানে মনিব কর্তৃক দাসদেরকে চব্বিশ ঘণ্টা কঠিন কাজে নিয়োজিত রাখা হ'ত অত্যন্ত নির্মমভাবে। আর সে দেশের গণতন্ত্র ছিল একান্তভাবে স্বাধীন-প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর জন্য। সেখানে সাধারণ জনগণের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না।[৭৮] গোটা ইউরোপে ভূ-স্বামী, সামন্ত প্রথা ও খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব শক্তিশালী ছিল। যা তাদের রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনায় দারুণ ভূমিকা রাখতো। রাষ্ট্রীয় কিছু ব্যক্তিবর্গ ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকারসহ নানা অধিকার সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা হ'ত। যেমন- বৃটেনে রাজা জন এবং সম্পদশালী ও ধনী ভূম্যাধিকারী বা ব্যারণদের মধ্যে ১২১৫ সালে একটি চুক্তি হয়, যাকে ঐতিহাসিক 'Magna carta' বলা হয়। এই চুক্তিতে নিশ্চয়তা ছিল- জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (Great council) পূর্বানুমতি ব্যতীত কাউন্সিলর খামখেয়ালীভাবে জনগণের উপর কর আরোপ করবে না। রাজকর্মকর্তারা যথেচ্ছভাবে জনগণের ভূসম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারবে না, জনগণ চুরির বিচার পাবার অধিকারী হবে। তবে ৬৩টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত ম্যাগনাকার্টা কখনই জনগণের চার্টার ছিল না। তা পরবর্তীতে হয়ে যায় Charter of English Liberties' এবং বর্তমানে এটি মানবাধিকার ও মুক্ত সরকারের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।[৭৯]

পরবর্তীতে শাসকরাই যেন স্বেচ্ছাচারী না হয়ে ওঠে, সেজন্য ইংলিশ বিপ্লবের মাধ্যমে ১৬৮৯ সালে পার্লামেন্টের মাধ্যমে 'বিল অব রাইটস'কে বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করা হয়। এভাবে 'পিটিশন অব রাইটস', 'বিল অব রাইটস' এবং 'ম্যাগনাকার্টা' এই তিনটি ঐতিহাসিক দলীলকে একত্রে বলা হয়, 'ইংলিশ সংবিধানের বাইবেল'। তবে হবস, লক ও রুশো ছাড়াও অপরাপর সকল রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও আইনবিদগণ এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে Grotius, Bon, Astim, Bentham, Laski প্রমুখ পণ্ডিতগণের চিন্তার ফলাফলের কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রফেসর ইলিয়াস আহমদ বলেন, 'রাজনৈতিক দর্শনে কর্তৃত্বকে দ্বারে দ্বারে হুমড়ি খেতে দেখা যাচ্ছে। কখনও এক ব্যক্তি থেকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং কখনও অসংখ্য ব্যক্তির হাতে, কখনও ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের হাতে, কখনও কখনও সংখ্যালঘুদের হাত থেকে সংখ্যাগুরুদের কাছে, কখনও সংখ্যাগুরুদের থেকে সংখ্যালঘুদের কাছে, কখনও প্রশাসন থেকে আইন পরিষদের কাছে, কখনও আইন পরিষদ থেকে বিচার বিভাগের কাছে এবং অবশেষে সমাজের নিকট থেকে পুনরায় রাষ্ট্রের একক দর্শকের দিকে।[৮০] ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী প্রখ্যাত রোমান আইন অভিজাত ও দাস শ্রেণীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল। ফলে সে আইন সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণে আসেনি। ইয়াহুদী ধর্ম জাতীয়তাবাদী শ্রেণী পার্থক্য সম্পন্ন ধর্ম। এখানে বাইরের লোকদের সাথে তার একবিন্দু সম্পর্কের বিষয়টি স্বীকৃত ছিল না।

অন্যদিকে খৃষ্টধর্মে প্রেমভালবাসার ঘোষণা নিয়ে এলেও তার মূলে ছিল মানুষে মানুষে মৌলিক বিভক্তি। যেমন- ইতিহাসের সকল অধ্যায়েই গীর্জা জনগণকে স্বাধীন চিন্তা ও মত গ্রহণ এবং তা প্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে; পাদ্রীদের মতের বিপরীতে হ'লে জনগণকে কঠিন ও নির্মম শাস্তি পেতে হ'ত। উত্তর ইউরোপে জনগণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য এবং ইউরোপীয় আন্দালুসিয়ায় মুসলমানদের খৃষ্টান বানাবার জন্য যে নির্মমতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে মানবতার ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।[৮১] আজও দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা চামড়ার অধিবাসী এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সাদা চামড়ার অধিবাসীদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে, তা মানবাধিকার সম্পর্কে ইংরেজদের দ্বিমুখীপনার জ্বলন্ত প্রমাণ।[৮২] খৃষ্টান মিশনারীরা বর্তমান সময়েও দুনিয়ার মুসলিম দেশে লোকদের খৃষ্টান বানানোর উদ্দেশ্যে নানা কৌশলে সেই কাজ করে যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে একালের বিভিন্ন মতাদর্শও মানুষে মানুষে বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টির কাজ করেছে, সাধারণ ও মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আকাশ-পাতালের পার্থক্যের প্রাচীর তুলে ধরেছে। সম্ভবতঃ এ লক্ষ্যে বৃটেনসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ন্যাটোর মাধ্যমে সারা বিশ্ব মানবাধিকার রক্ষার পরিবর্তে মানবাধিকারকে পদদলিত করছে।

আমেরিকায় মানবাধিকার : আমেরিকা ছিল একটি বৃটিশ কলোনী। কলোনীগুলোতে চলত বৃটিশ রাজ্যের শাসন। ইংরেজ রাজা কলোনীর শাসনকার্য পরিচালনায় তাদের কোন সুযোগ দিতেন না; উপরন্তু তাদের ওপর 'ট্যাক্স' আরোপ করতেন। অবশেষে আমেরিকানরা এই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এবং তারা ১৭৭৬ সালের ১২ই জুন ভার্জিনিয়াতে একটি Bill of Rights গ্রহণ করে, যার

---

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৭৮. মাওলানা আব্দুর রহীম, ইসলাম ও মানবাধিকার (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী), পৃঃ ৪।

৭৯. Dr. M. Ersloadul Bari, International concern for the Promation and Protection of Human Rights, Dhaka University Studies Part F. vol. 11 (1). 21. মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও, ডঃ হেবা মণ্ডল ও ডঃ শাহজাহান মণ্ডল, শামস পাবলিকেশনস, ঢাকা- ২য় প্রকাশ পৃঃ ৮।

৮০. সালাউদ্দীন, মৌলিক মানবাধিকার, অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবুল বাশার আখন্দ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন), পৃঃ ২৭-২৮।

৮১. ইসলাম ও মানবাধিকার, পৃঃ ৫।

৮২. মৌলিক মানবাধিকার, পৃঃ ২৯।

রচিয়তা ছিলেন জর্জ ম্যানসন। এর ২১ দিন পর ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (স্বাধীনতা দিবস) ফিলো ডিলফিয়াতে প্রথম কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস আমেরিকার ১৩টি কলোনী ঘোষণা করেন 'আমেরিকার রুশো বলে খ্যাত টমাস জেফারসন'। এই ঘোষণায় মানুষের সাম্য, জীবন, চলাফেরা, স্বাধীনতা সহ নানা অধিকারের বিষয় স্বীকৃতি পায়। এতে বলা হয়, যদি কোন সরকার এই অধিকার দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই সরকারকে ধ্বংস করে নতুন সরকার গঠন করতে হবে।[৮৩]

আমেরিকার মানবাধিকার অবস্থা বৃটেন ও ফ্রান্স থেকে মোটেও পৃথক নয়। আমেরিকার শেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী ঐ মহাদেশের মূল বাসিন্দা রেড ইণ্ডিয়ানদের গোটা সম্প্রদায়কেই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। নিজেদের 'নতুন বিশ্ব' গড়ার ও উন্নতি সাধনের জন্য তারা আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের পশুর মত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের দাসে পরিণত করে এবং জাহায বোঝাই করে আমেরিকায় নিয়ে যায়। এসব গোলাম যথারীতি ক্রয়-বিক্রয় হ'ত। আফ্রিকার যে উপকূল থেকে তাদের জাহাযে বোঝাই করা হ'ত তার নাম হয়েছে 'দাস উপকূল' (Slave Coast)। এই আমদানীকৃত গোলামদের যে বংশধর এখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তারা আজ পর্যন্ত সমান অধিকার পায়নি। তারা যখনই আমেরিকার সংবিধানে প্রদত্ত মানবাধিকার পুনরুদ্ধারের দাবী জানায় তখনই তাদের ওপর নির্মম জুলুম-অত্যাচার চালানো হয়। এ বিষয়ে রবার্ট ডেবি ভর্ৎসনা করে বলেন, পাঁচ লাখ গোলাম এবং হাযার হাযার আমদানীকৃত শ্বেতাঙ্গ সেবকদের কলোনীতে বসে গোলামদের এক ধনবান মনিব টমাস জেফারসন কত বাগাড়ম্বর সহকারে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার স্মৃতিচারণ করছে'।[৮৪] এই আভ্যন্তরীণ গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্যের কথা বাদ দিয়ে এখন বহির্বিশ্বে আমেরিকার ভূমিকা মূল্যায়ন করলে আরও ভয়ংকর দৃশ্য স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। হিরোশিমা, নাগাশাকি, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ইরাক, ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র আমেরিকার হাতে মৌলিক মানবাধিকার পদদলিত করার হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, আমেরিকা থেকে প্রতি বছর যে পরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়, তা তৃতীয় বিশ্বের বুভুক্ষু জনগণের ৩ বছরের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হ'তে পারে।

বিশ্বে নেতৃত্বের অগ্রনায়ক, মানবাধিকারের রক্ষক (?) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরের খবর অত্যন্ত শোচনীয়। সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা, বেকার সমস্যা ও আইন-শৃংখলার অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। অথচ বিশ্বের বহু মানুষ জানে না সেখানে কি ঘটছে? আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস-এর 'ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সারভে ব্যুরো অব জাস্টিস' প্রকাশিত রিপোর্টে ১৯৯৬ সালে ৩,০৭,০০০টি ধর্ষণের অভিযোগ রেকর্ড করা হয়েছে। সে হিসাবে ঐ বছর আমেরিকাতে প্রতিদিন গড়ে ২,৭১৩ জন অর্থাৎ প্রতি ৩২ সেকেন্ডে ১ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে।[৮৫] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তাদের ৩৩১টি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে। হাযার হাযার কর্মচারী-কর্মকর্তা চাকুরী হারিয়েছেন। এমনকি এ মাসেই খোদ নিউইয়র্ক সিটিতে ছয় হাযার শিক্ষক চাকুরী হারাতে যাচ্ছেন। সেদেশে প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১ জন হতদরিদ্র। চিরবৈরী চীনের নিকটে তারা এখন ৩ হাযার মার্কিন ডলার ঋণী।[৮৬]

ফ্রান্সে মানবাধিকার : ফ্রান্সে মানবাধিকারের জন্ম, ধারণা ও পরিস্থিতিও প্রায় বৃটেন ও আমেরিকার পর্যায়ে। কারণ তৎকালে ফ্রান্সের মধ্য শ্রেণী কৃষ্ণাঙ্গরা রাজা কর্তৃক মারাত্মকভাব শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত হয়েছে। এই বিপ্লবীরাই (মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষক) ১৭৮৯ সালে স্বৈরাচারী রাজাকে উৎখাত করে একটি খসড়া দলীল ঘোষণা করে। যার নাম Declaration of Rights of man and of the Citizen. ঘোষণাটির খসড়া দলীল তৈরী করেন জেনারেল দ্য মার কুইজ ডি লাফায়েত, যিনি ছিলেন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের বন্ধু এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে লাফায়েতকেও বেশ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। ১৭৮৯ সালের ২৬শে আগষ্ট গৃহীত এই ঘোষণায় বলা হয়, Men are born and remain free and equal in Rights *(অনুচ্ছেদ ১)* এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হ'ল স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ *(অনুচ্ছেদ-২)*। এই ঘোষণায় আরও সন্নিবেশিত ছিল খামখেয়ালী গ্রেফতার থেকে মুক্তি *(অনুচ্ছেদ ৭)*, ধর্মীয় স্বাধীনতা *(অনুচ্ছেদ ১০)*, বাক ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার *(অনুচ্ছেদ ১১, ১৭)*। তাই ফ্রান্সের এই দলীলকে American Declaration-এর 'কনিষ্ঠ ভগ্নি' বলা হয়। এই ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১০-এ ফ্রান্সের জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হ'লেও তা বর্তমান শাসকবর্গের পদতলে পিষ্ট হচ্ছে। ইতিমধ্যে (২০১১ সালে) সেখানে মুসলিম নারীদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন কেউ অমান্য করলে তাকে জেল-জরিমানাসহ বিভিন্ন দণ্ড পেতে হবে। সম্প্রতি আরব দেশ থেকে ৩ জন হিজাব পরিহিতাকে ফ্রান্সের এয়ারপোর্ট থেকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। কারণ সে দেশের আইনানুযায়ী বোরক্বা/হিজাব নিষিদ্ধ। এয়ারপোর্ট থেকে তাদের হিজাব খোলা ছাড়া তারা ফ্রান্সে প্রবেশ করতে দিবে না। ফলে মুসলিম মহিলারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এটা নিয়ে বিশ্বে হৈচৈ পড়ে গেছে। তবুও তাতে কোন কাজ হয়নি। এখানে মুসলিম ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করা হ'ল যা জাতিসংঘ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। অথচ পশ্চিমা শক্তিগুলো এখন এসব ব্যাপারে যেন মুখে কুলুপ এঁটেছে।

---

৮৩. ডঃ রেবা মন্ডল ও ডঃ শাহজাহীন, মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও, (ঢাকা : সামস্ পাবলিকেশন্স), পৃঃ ১০।

৮৪. *R.Edewey, Freedom, p.347*; মৌলিক মানবাধিকার, জুন, ২০০৪, পৃঃ ৩০।

৮৫. ডা. জাকির নায়েক, লেকচার সমগ্র, অনুবাদ ও সংকলন : মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবু হানিফ (ঢাকা : ইসলামিক একাডেমি বাংলাদেশ), পৃঃ ১১১।

৮৬. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৪তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০১১, সম্পাদকীয়।

ফ্রান্সে মানবাধিকার সনদকে ১৭৯১ সালে আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হ'লেও সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 'যদিও উপনিবেশগুলো এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত কোন দেশে ফরাসী রাষ্ট্রের একটি অংশ, কিন্তু এই আইন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তাহ'লে এখানে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ফ্রান্সে যে মানবাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তা অপরিপূর্ণ ও লংঘনীয় ও জাতীয়তাবাদের রাহুগ্রাসে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা। তাই তো পুরানো 'সাম্রাজ্যনীতি'র হস্ত সম্প্রসারণের নতুন আক্রমণের শিকার হ'ল মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলো তথা লিবিয়া আক্রমণ। একই নীতিতে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, তাদের ক্রীড়নক ন্যাটো সহ গোটা পাশ্চাত্য দেশগুলোর ন্যক্কার জোটবদ্ধতা, তথাকথিত গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা প্রমাণ করেছে- বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার একমাত্র রক্ষক তারাই (?); এরাই আবার জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

মানবাধিকারের সমাজতান্ত্রিক ধারণা :

পাশ্চাত্যে মানবাধিকারের ধারণার সাথে সাথে আমাদের সমাজতান্ত্রিক মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা থাকা যরূরী। কারণ মানবাধিকারের উদগারক হিসাবে এদের দাবীর কমতি নেই। তাই এর প্রথম ও প্রধান উদগারক হ'ল জার্মান বংশের কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)। কার্লমার্কসকে পারিবারিক প্রতিকূলতায় যুবক বয়সে তাঁর পিতা হার্সকেল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। সেখানে তিনি আইন, ইতিহাস ও দর্শনের উপর পড়ালেখা ও গবেষণা করেন। বিশেষ করে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেগেল-এর দর্শনশাস্ত্র, প্রকৃতি তত্ত্ব প্রভৃতি বই পড়ে যুবসমাজের উপর এক বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি শাসক বিরোধী লেখার কারণে জার্মান থেকে ফ্রান্সে বিতাড়িত হন। সেখানে অবস্থানকালে প্রকাশিত Vorwart গ্রন্থে তার ভবিষ্যত জীবনের চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে তিনি ধর্ম নিয়ে এক বিতর্কিত বক্তব্য লিখলেন, 'ধর্ম পৃথিবীর মানুষের দুঃখ ভোলাবার জন্য স্বর্গের সুখের প্রতিশ্রুতি দেয়। এ আর কিছুই নয়; আফিমের মত মানুষকে ভুলিয়ে রাখবার একটা কৌশল'। দার্শনিকদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা শুধু নানাভাবে জগতের ব্যাখ্যা করা ছাড়া কিছুই করেনি। আমরা শুধু ব্যাখ্যা করতে চাই না, চাই জগতকে পালটাতে। এখানে তার দর্শনের সাথে শুরু হয় উঁচু শ্রেণীর সংঘাত। অনিবার্য এই অস্থিতিশীল পরিবেশের কারণে ফরাসী সরকার তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। এখানে পনেরো মাসের জীবনে পরিচয় হয় আর এক সংগ্রামী দার্শনিক ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, যিনি মার্কসের ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যুর পর তার বাকী কর্মের বাস্তবায়ন করেন। সমাজতান্ত্রিক ধারণা নিয়ে ১৮৪৭ সালে প্রথমে গড়ে উঠল আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট লীগ। যেখানে যোগ দেয় বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানী, লন্ডনের প্রতিনিধিরা। এখানেই মার্কস এঙ্গেলসের যৌথ কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করা হয়।[৮৭]

মার্কস ৫ সদস্যের সংসারে অত্যন্ত কষ্ট করে মানবেতর জীবন যাপন করতেন। দু'কামরা বিশিষ্ট কক্ষে কোন রকম ঠাঁই নিয়ে বেঁচে ছিলেন। পরের দিন খাওয়া জুটবে কি জুটবে না তা কেউ জানে না। জামা-কাপড়, জুতোর অবস্থা এমন যে, বাইরে যাওয়া দুষ্কর। বহুদিন গিয়েছে শুধু একটি জামার অভাবে ঘরের বাইরে যেতে পারেনি মার্কস। অভুক্ত শিশুরা বসে আছে শূন্য হাঁড়ির সামনে। দোকানী ধারে কোন মাল দেয়নি। এমনি করে তার কত দিন-রজনী কেটেছে নিদারুণ কষ্টে। তবে বন্ধু এঙ্গেলস তাকে সহযোগিতা করেছে। সম্ভবত এ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ধনী-গরীবের ব্যবধান ঘুচানোর জন্য গড়ে তোলেন শ্রেণী সংগ্রাম, যা আজও তার চেতনায় উজ্জীবিত। মার্কস মনে করতেন, সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি হ'ল অর্থনীতি। যাদের হাতে উদ্ধৃত্ত অর্থ সঞ্চিত হবে, তারাই হবে সবচেয়ে ক্ষমতাবান, সমাজের প্রভু। যা ১৮৬৭ সালে তার বিখ্যাত 'ড্যাস ক্যপিটাল' (Das Capital) বই-এর মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এই বইটিই মূলতঃ ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের প্রেরণা যুগিয়েছিল।[৮৮] এই ধারণা মার্কসবাদ তথা কমিউনিজম স্বীকার করে না। যদি এমন কোন উচু-নীচু বা অসম পার্থক্য দেখে, তাহ'লে সমাজতান্ত্রিক নীতিতে রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গ সে শক্তিকে নিমিষে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ এই নীতিতে নিজের বলে কোন সম্পদ, অর্থ থাকবে না। সবই থাকবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে।

সমাজতান্ত্রিক দর্শনের চিন্তা ও ধারণা জনগণের মধ্যে এমনভাবে গ্রোথিত হয়েছিল, কখনও কখনও যার মারাত্মক পরিণতি স্বয়ং কমিউনিষ্ট নেতা ও শাসকগণকেই বহন করতে হয়েছিল। এ রকমই এক ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কমিউনিষ্ট নেতা ক্রুশ্চেভ-এর এক সুন্দরী কুমারী মেয়ে ছিল। এক সময় অনুসারীরা তার মেয়েকে তার সামনে থেকে ছিনিয়ে নিতে যায়। তখন ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, 'তোমরা আমার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছ কেন?' তখন জনগণ বলেছিল, আপনি তো বলেছেন, রাষ্ট্রে 'আমার ব্যক্তির' বলে কোন কিছু থাকবে না, সবই রাষ্ট্রের। সুতরাং এ সুন্দরী মেয়ে আপনার না, রাষ্ট্রের তথা জনগণের। তাই এ মেয়েকে ভোগ করার অধিকার আমাদের সকলের। তখন ক্রুশ্চেভ মেয়েকে রক্ষা করতে পারেননি। সেদিন শুধু পথচেয়ে নির্বাক চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তার করার কিছুই ছিল না। এই তো হ'ল হতভাগা শাসক আর কমিউনিজ্যম কনসেপ্ট বা ধারণা।

একই নীতি ও ধারণা নিয়ে রাশিয়ায় জন্ম নিল ভি. গাই লেলিনের সমাজ বিপ্লবের নতুন ধারা। ১৯০৩ সালে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরে পুলিশের ভয়ে একটি ময়দার গুদামে জন্ম নিল বলশিয়াভিক পার্টি। দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ১০ বছর পর লেলিন ১৯১৭ সালে ১৬ই এপ্রিল দেশে ফিরে গোপনে উঠলেন বোন আনার বাড়িতে। এর মধ্যে পুলিশ টের পেয়ে তাকে ধরতে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সেখান থেকে তিনি চাষীর ছদ্মবেশে পালিয়ে সীমান্তের রাজর্লি শহরে ছোট্ট কুড়ে ঘরে

৮৭. Mychel H. Heart, THE HUNDRED, P. 124-125.

৮৮. তদেব, পৃঃ ১২৫।

বসে চিঠি লিখলেন, 'বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠা করতে হবে মার্কসবাদ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়। সে লক্ষ্যে ১৯১৭ সালের ২৪শে অক্টোবর শুরু হ'ল রাশিয়ায় সশস্ত্র বিপ্লব। এ বিপ্লব ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন- একমাত্র কৃষি ক্ষেত্রে মার্কসীয় নীতি বাস্তবায়নের জন্য ১৯ লক্ষ কৃষকের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে মেশিনগান চালিয়ে। দেশে সকল ছাত্র-যুবককে ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে। তা না করলে তাদের উপর চালানো হয়েছে কারা নির্যাতন ও অমানবিক অত্যাচার। মুসলমানদের উপর বিধি নিষেধ করলে সে দেশ থেকে ৩০ মিলিয়ন মুসলমান বিতাড়িত হয়।[৮৯] বিপ্লবের সময়ে পৌনে ২ কোটি মানুষ নিহত হয়। এ সম্পর্কে রুশ সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রফেসর পিটিরিম সরনিক রুশ বিপ্লবে মানুষের জীবন নাশের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ১৯১৮-২২ সালের বিপ্লবে সরাসরি সংঘর্ষে ছয় লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। প্রতি বছর গড়ে লক্ষাধিক লোক নিহত হয়। গৃহযুদ্ধে নিহত এবং পরোক্ষ আক্রমণে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৫০ লাখ থেকে এক কোটি ৭০ লাখ।[৯০] লাল বিপ্লবের খুনী চেহারা দেখে জীবন বাঁচানোর জন্য দেশ থেকে দশ লাখ লোক পলায়ন করে।[৯১] এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে অধিকারের ধারণা মানবীয় নয়, বরং গোত্রীয়, আঞ্চলিক, জাতীয়তাবাদী ও তাত্ত্বিক গোঁড়ামির দোষে দুষ্ট। তারা অন্যের অধিকারের প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কা করে না।

এভাবে সমাজতন্ত্রের জন্মের ঠিক কয়েক যুগ পার না হ'তেই ১৯৯০ দশকে সমাজতন্ত্রের সুতিকাগার সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রটি ভেঙ্গে ডজনেরও বেশী রাষ্ট্র তৈরী হ'ল। পৃথিবী থেকে এক প্রকার বিদায় নিল মার্কসবাদ, লেলিনবাদের সেই ভয়ংকর একপেশে মতবাদ। নানা রঙে পরিবর্তন হ'ল সেই মতবাদ। লেলিন বলেন, 'আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হচ্ছে গরীব জনগণের শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থ'।[৯২] অর্থাৎ লেলিনের কথা অনুযায়ী সমাজে কোন উঁচু-নীচু মানুষ বলে কেউ থাকবে না। সবাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দিক দিয়ে সমান। কিন্তু বাস্তবে তা কি সম্ভব? কেউ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হবে, কেউ হবে সুইপার। তাই বলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় দু'জন কি এক হতে পারে? আবার কেউ ধনী হবে, কেউ হবে ফকীর এটাই স্বাভাবিক। ধনীরা গরীবদেরকে যাকাত, দান এবং নানা দিক দিয়ে সহযোগিতা করবে এটাই নিয়ম। তবে ধনী-গরীবের মধ্যে ব্যবধান কম হবে। কোন গরীব-মিসকীন যেন না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়, তার ব্যবস্থা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যেমন- ইসলামের পঞ্চম খলীফা নামে পরিচিত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায়, তাহ'লে তার জন্য ওমরকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। খলীফার এ উক্তি থেকে এ কথাই অনুমিত হয় যে, তখন ধনী-গরীবের ব্যবধান খুব একটা ছিল না। আর থাকলেও ঐ সময়কার শাসকগণ গরীবদের ব্যাপারে কত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। অভুক্ত প্রতিবেশীর প্রতি জোরাল খেয়াল রাখা এসব মুসলিম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, ছোট-বড় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক ধারণায় এসব থাকা চলবে না। আসলে সমাজতান্ত্রিক ধারণাটি ভুলের উপরে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ যে ধারণার নৈতিক কোন ভিত্তি নেই, নেই কোন পারলৌকিক জবাবদিহিতা-সেখানে তো গলদ থাকবেই। তাইতো এ সম্পর্কে সি.ডি কারনিগ বলেন, মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত আইনের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে তার কোন বৈধতাকে এখানে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রের বিপরীতে নাগরিকদের কার্যকর হেফাযতের গ্যারান্টি এখানে অসম্ভব করে তোলা হয়েছে।[১৬] এখানে 'প্রাকৃতিক আইন' বলতে প্রকৃতিগত উপায়ে তথা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আইনকে বুঝানো হয়েছে। এখানে একটা কথা সুস্পষ্ট যে, মানুষের মনগড়া যেকোন ধরনের নিয়ম বা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা হৌক না কেন, তাতে মানব জাতির মুক্তির কোন গ্যারান্টি নেই, যা আছে শ্বাশত বিধান ইসলামে।

[চলবে]

৮৯. ইসলাম ও মানবাধিকার, ই.ফা.বা. পৃঃ ৬।
৯০. *Sorinik Pitirim A, The Crisis of our Age (New Yourk: E.P. Duttan & Co., 1951), P. 229;* মৌলিক মানবাধিকার, পৃঃ ৩০।
৯১. তদেব, পৃঃ ৩১; *Encylo. Britannica, 15th ed. Vol. 16, P. 71.*
৯২. মৌলিক মানবাধিকার, পৃঃ ৩৫।

১৬. তদেব, পৃঃ ৩২-৩৩।

হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডা. হ্যানিম্যান ও তার ইসলাম গ্রহণ

ডা. এস.এম. আব্দুল আজিজ

'আমি বৃথা জীবন ধারণ করিনি, সমস্ত কিছুই প্রমাণ করব, যা ভাল তা শক্ত করে ধরব'। বিশিষ্ট গবেষক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখাপড়া করে ডাক্তার হন এবং অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী রোগীদের সেবা প্রদান করতেন। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি তিনি গবেষণা ও চিকিৎসা বিষয়ক বইয়ের অনুবাদ করেছেন। গবেষণার এক পর্যায়ে তিনি অ্যালোপ্যাথিতে ক্ষতিকর সাইড অ্যাফেক্ট (পার্শপ্রতিক্রিয়া) দেখতে পান। এতে তিনি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন। সাইড অ্যাফেক্টের কারণ নির্ণয়ের গবেষণার মাধ্যমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সূত্র আবিষ্কৃত হয়। পেরুভিয়ান কপি বা সিঙ্কোনা গাছের বাকল নিয়ে গবেষণা করতে করতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উদ্ভব হয়। সুস্থ মানবদেহে ওষুধ প্রয়োগ করে ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ওষুধের গুণাবলী পরীক্ষা করতেন। এ ধরনের গুণাবলী যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যেত তখন তিনি তা প্রয়োগ করলে রোগটি সেরে যেত। এটাকে বলে সদৃশ বিধান বা হোমিওপ্যাথি।

এভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে ওষুধ পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ করার চিকিৎসা বিধান প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞানী ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৭৯০ সালে মানবদেহে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয়। ডা. হ্যানিম্যান নিজের শরীরে প্রথম পরীক্ষা করলেন 'সিঙ্কোনা'। এক কথায় আমরা বলতে পারি ১৭৯০ সনে হোমিওপ্যাথির যাত্রা। হ্যানিম্যান নিজের শরীরে ৯৯টি ওষুধ প্রয়োগ করেন। পৃথিবীর কনিষ্ঠতম চিকিৎসা পদ্ধতি হ'ল হোমিওপ্যাথি। ওষুধ পরীক্ষার পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নিয়ম-নীতি প্রকাশ করেন ১৮১০ সালে। অর্গানন নামে যার পরিচিতি চিকিৎসক মহলে। তার জীবনের শেষ পর্যায়ে অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ সমাপ্ত করেন। বইটির আধুনিক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে হ্যানিম্যান ফাউন্ডেশন, আমেরিকা থেকে। হোমিওপ্যাথির জন্ম জার্মানীতে। বিকাশ ফ্রান্সে, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ব্রিটেনে ১৮০৫ সালে। প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দি প্যারিস কলেজ অব হোমিওপ্যাথি'। ডা. হ্যানিম্যান সম্পর্কে ড. হুদহুদ মোস্তফার গবেষণা থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় ভীষণভাবে আক্রান্ত আর সত্য চাপা দিতে অত্যন্ত পারদর্শী পশ্চিমা জগৎ যতদিন সম্ভব সম্রাট নেপোলিয়ান, মার্মাডিউক এবং পিকথল, মরিস বোকাইলি, নীল আর্মস্ট্রংসহ আরো অনেক মনীষীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। সত্য কোন দিনই হারিয়ে যায় না। কালের প্রবাহে কোন একদিন প্রকাশিত হয়ই। সম্ভবত সবচেয়ে বেশী সময় ধরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিস্কর্তা ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের ইসলাম গ্রহণের সংবাদটি চাপা পড়ে আছে। ড. হুদহুদ মোস্তফা এক নিবন্ধে লিখেছেন অনেক কথা। ১৯৯৮ সালে লন্ডনে এক সেমিনারে ডা. মোস্তফার সাক্ষাৎ ঘটে এক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে। তার নাম উইলিয়াম হ্যানিম্যান। বিজ্ঞানী ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানেরই এক উত্তর-পুরুষ তিনি। বিশ্বাসে ক্যাথলিক খৃষ্টান। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান গবেষণার এক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি আমৃত্যু ইসলামী বিশ্বাসেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যে কারণে তিনি নিজ জন্মভূমি, স্বজাতি, আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করে দ্বিতীয় স্ত্রী মাদাম ম্যালনীকে নিয়ে প্যারিসে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মাদাম ম্যালনীও স্বামীর সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হ্যানিম্যানের অনুসন্ধান স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান আহরণের জন্য বহু ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। পুরাকালের বিভিন্ন সভ্যতার যুগে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করতে গিয়ে ইসলামের স্বর্ণযুগের আবিষ্কার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান লাভের জন্য আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন, তদুপরি আরব বণিক ও পরিব্রাজকদের কাছ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের ধর্ম, সম্পর্কেও অবগত হন। আরবী ভাষায় দক্ষতার কারণে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও তিনি অধ্যয়ন করেন। ক্রমে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। এক শুভক্ষণে তিনি ইসলামের কালেমা পাঠ করে মনে প্রাণে মুসলমান হয়ে যান। এ ঘটনা জানাজানি হয়ে পড়লে হ্যানিম্যানের আত্মীয়-স্বজনরা তার প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েন। চির পরিচিত পরিবেশ তার বিরুদ্ধে চলে যায়। শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে সব সহায় সম্পদ উত্তরাধিকারী ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দিয়ে তিনি ইসলামে নবদীক্ষিত স্ত্রী মাদাম ম্যালানীকে নিয়ে প্যারিসের পথে হিজরত করেন। এ সময়টা ছিল ১৮৩৫ সালের জুন মাস। তারা তাদের জীবদ্দশায় আর কখনও জার্মানীতে ফিরে যাননি। হিজরত নবীদের সুন্নাত। ইসলাম গ্রহণের কারণে জার্মান বিজ্ঞানী হ্যানিম্যানকেও সেই সুন্নাতেরই অনুসরণ করতে হয়। ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম হ্যানিম্যান আরো কিছু মহামূল্যবান তথ্য দিয়ে সবাইকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

প্রথমেই তিনি ডা. মোস্তফাকে বলেছিলেন লন্ডনস্থ হ্যানিম্যান মিউজিয়ামে যেতে। ঠিকানা : হ্যানিম্যান মিউজিয়াম পাউইজ প্যালেস, গ্রেট আরমন্ড স্ট্রিট, লন্ডন, ডব্লিউসি। সেখানে হ্যানিম্যানের ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র আছে। বই-পুস্তকের এক বিরাট সংগ্রহও আছে। এর মধ্যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে শুরু করে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু আলী ইবনে সিনা বিরচিত আল-কানুন ফিত তিবসহ শতাধিক আরবী গ্রন্থ রয়েছে। ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে মসজিদের নকশা করা জায়নামায, মূল্যবান পাথরের তসবীসহ, একটি টার্কিশ টুপি। ব্যবহৃত জায়নামাযে সেজদার চিহ্ন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা

যায়। এসব নিদর্শন ড. মোস্তফার মনে গভীর দাগ কাটে। বিজ্ঞানী হ্যানিম্যান সম্পর্কে তিনি লেখাপড়া ও অনুসন্ধান শুরু করেন।

তার অনুসন্ধান ও গবেষণার চার বছর চলছে। বক্ষমান প্রবন্ধে তিনি এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি সংক্ষেপে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সত্য ও বাস্তবতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন।

১. ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান তার কোন লেখায় খৃষ্টবাদের মূলমন্ত্র 'তৃতত্ত্ব' (TRINITY) সম্পর্কে কখনও উল্লেখ করেননি; বরং এক সৃষ্টিকর্তা, God, Creator প্রভৃতি একক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

২. রিচার্ড হ্যাল কর্তৃক লিখিত হ্যানিম্যানের জীবনী গ্রন্থ Samuel Hahnemann : His Life and work-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় এক রোগীকে লেখা পত্রে উল্লেখ করেন : We feel then we are resting in the friendship of the only One. Do you desire any other religion? There is none. Everything else is a miserable low human conception full of superstition a true destruction of humanity. তিনি একই পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অপর এক পত্রে লিখেছেন : I acknowledge with sincere thankfulness the infinite march of the One-great giver of all good. আবার একই পুস্তকে ৩৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে :

I shall not become a catholic and I would prefer not even to limit myself in the creed of the protestant but rather to hold with you to deism only a higher sense is rather to hold with you to deism only a higher sense is taught by the Seet to that name, as that is the faith which most nearly satisfies? এ স্বীকৃতি ইসলাম ছাড়া কি হ'তে পারে?

৩. ড. আর ই ডাজেন কর্তৃক সংগৃহীত হ্যানিম্যান লেসার রাইটিংস গ্রন্থের ৫৭১, ৫৭৯ পৃষ্ঠায় আরবী লেখা উদ্ধৃতি দেয়া আছে। যা হ্যানিম্যানের আরবী ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে।

৪. হ্যানিম্যানের ইসলাম গ্রহণ এবং জার্মানী ত্যাগের পর তিনি আর কখনও কোথাও তার পিতৃ প্রদত্ত নাম ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডারিক আদ্য শব্দ দু'টি ব্যবহার করেননি। যে শব্দ দু'টো খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী পরিচয় বহন করে। প্যারিসে হিজরতের পর চিঠিপত্রসহ সর্বত্র কেবল 'স্যামুয়েল হ্যানিম্যান' লিখতেন। স্যামুয়েল ইসরাইল বংশীয় একজন নবীর নাম, যা একজন মুসলমানের নাম হিসাবেও গ্রহণযোগ্য। একথা তার খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগের আর একটি শক্তিশালী প্রমাণ।

৫. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ম্যাগাজিনে ২৫৪ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে : মাদাম ম্যালানী তার স্বামী হ্যানিম্যানের মৃত্যুপূর্ব অছিয়তের কারণে কোন অমুসলিমকে তার দাফনে অংশগ্রহণ করতে দেননি। তিনি দাফনের দিনক্ষণ সবই গুপ্ত রেখে কোন মুসলমানের সাক্ষাৎ পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছিলেন। হ্যানিম্যানের মৃত্যু ২ জুলাই ১৮৪৩ তারিখে। কোন মুসলমানের সাক্ষাৎ না পেয়ে ম্যালানী নিজে তার সমবিশ্বাসী (নবদীক্ষিত মুসলিম) দৃঢ় প্রত্যয়ী দু'ব্যক্তির সহযোগিতায় মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী হ্যানিম্যানকে মৃত্যুর ৯ দিন পর ১১ জুলাই কবরস্থ করেন। হ্যানিম্যানেরই ইচ্ছা অনুযায়ী প্যারিসের অখ্যাত মাউন্ট মারাট্টির গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এটি খৃষ্টানদের গোরস্থান হ'লেও একটু আলাদা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি হ্যানিম্যান তার সমাজের প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগের কারণে জার্মানীতে পরিচিত পরিবেশ তার বিরুদ্ধে চলে যায়। নিরাপত্তা ও শান্তির সন্ধানে তিনি ১৮৩৫ সালের জুন মাসে ৮০ বছর ২ মাস বয়সে তার পৈতৃক দেশ জার্মানী ত্যাগ করেন। আর কখনও তিনি বা তার স্ত্রী ফ্রান্স থেকে জার্মানীতে ফিরে যাননি। এতে প্রমাণিত হয় ইসলাম গ্রহণের ফলে বিজ্ঞানী হ্যানিম্যান ও মাদাম ম্যালানীর জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা জার্মানিতে কতটুকু বিপন্ন ছিল। সর্বাধুনিক ও অতি উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্ব শুধু কি মুসলমানী গন্ধের কারণেই হোমিওপ্যাথিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না? ড. মোস্তফা লিখেছেন বিজ্ঞানী হ্যানিম্যান সাহিত্যের যতদূর গভীরে আমি পৌঁছতে পেরেছি, ততটুকুর মধ্যে কোথাও আমি ইসলামের মহানবী (ছাঃ)-এর নীতি আদর্শের পরিপন্থী কোন কিছুই খুঁজে পাইনি। বরং আমি উপলব্ধি করেছি হ্যানিম্যানের রচনাবলী ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের গভীর ছাপ বিদ্যমান। ইসলাম বলে, 'নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য উৎসর্গিত' *(আন'আম ১৬২)*।

সেই সুরে সুর মিলিয়ে হ্যানিম্যানও বলে গেছেন, আমি আমার জীবনে কখনও স্বীকৃতি চাইনি, মানব কল্যাণে আমার আবিস্কৃত সত্যের জন্য আমি স্বার্থপরতামুক্তভাবে যার বিকাশ ঘটিয়েছি সমগ্র বিশ্বের জন্য, যা সর্বোচ্চ সত্তার নিমিত্তে উৎসর্গিত। Life & Work of Hahnemann-By Richard Raehl. হ্যানিম্যানের প্রবাদ তুল্য উক্তি 'রোগীকে চিকিৎসা কর রোগকে নয়'।

[সংকলিত]

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য :

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[৯৩]

যাকাতের প্রকারভেদ :

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্ত গত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব :

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[৯৪]

যাকাতুল ফিৎর :

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন'। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ :

পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফক্বীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩. **'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ**। অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫. দাসমুক্তির জন্য**। এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭. ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা ৮. **দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৯৫]

বায়তুল মাল জমা করা :

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৯৬]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

৯৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
৯৪. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়।*
৯৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*
৯৬. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আৎ ১/২০৭ পৃঃ।*

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েল:

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্ক্ষা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল:

১. ছিয়ামের নিয়ত: নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আ: 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতালাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'*। 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আলাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল'।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৫]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে'।[৬] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৭]

৫. সাহারীর আযান: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৯]

৬. ছালাতুত তারাবীহ: ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ **১১** রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উলেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত **১১** রাক'আতের বেশী ছিল না।[১০]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে **১১** রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১২]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৩] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৪]

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
৫. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৬. আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৭. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
৮. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।
৯. নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।
১০. বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।
১১. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
১২. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।
১৩. আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।
১৪. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরূত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৫] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ: 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৬]

৮. ফিৎরাঃ (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৭] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত **১২** তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৮] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৯]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কথা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[২০] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২১] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২২] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২৩] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৪]

১৫. মিশকাত হা/১৩০২।
১৬. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১৮. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৯. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
২০. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
২১. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
২২. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
২৩. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
২৪. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

নজরুলের কারাজীবন ও বাংলা সাহিত্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ

অধ্যাপক এনায়েত আলী বিশ্বাস

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিতীয় কবি যিনি কবিতা লেখার জন্য কারাবরণ করেন। কবিতার জন্য কারাবরণকারী প্রথম হলেন সিরাজগঞ্জের 'অনল প্রবাহ' কবি ইসমাঈল হোসেন সিরাজী। কিন্তু নজরুল যেমন কবিতায় আলোড়ন সৃষ্টি করে ব্রিটিশের মত রাজশক্তিকে নাড়িয়ে তুলেছিলেন, এমন আর কেউ পারেননি। এদিক থেকে নজরুল জাতীয়তাবাদী কবি হিসাবে আজো সকলের শ্রদ্ধেয়।

১৯২২ সালে যুদ্ধ ফেরত নজরুল বন্ধুকে নিয়ে প্রকাশ করলেন সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। শৌর্যের বার্তাবহ এ কাগজ তরুণচিত্তে অপূর্ব আত্মদানের আহ্বান নতুন করে জাগাল। বাংলার বিপ্লবী মন বিস্ময়ে 'ধূমকেতু'র প্রতিটি অক্ষরে প্রাণের কথা পাঠ করে উৎসাহিত হ'ল। টনক নড়লো ব্রিটিশ সরকারের। তারা ধূমকেতুকে দমন করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলো। পূজা সংখ্যার ধূমকেতুতে কবিতা বেরুল :

'আর কতকাল থাকবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল,
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।

মাস দুই যেতে না যেতেই পুলিশ এসে হানা দেয় ধূমকেতু অফিসে। ছাপাখানাকেও রেহাই দিল না। সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশক নজরুল ফেরার হয়ে গেল। কিন্তু কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল নজরুলকে। ধূমকেতুর মামলায় পুলিশ কোর্টে যে চাঞ্চল্য জাগালো তা অবর্ণনীয়। বহু উকিল স্বেচ্ছায় এলেন নজরুল তথা ধূমকেতুর পক্ষ সমর্থনের জন্য। মলিন মুখোপাধ্যায় হলেন প্রধান উকিল। সাক্ষী শেষে নজরুল এক লিখিত জবানবন্দি দাখিল করেন। তাতে কবি বলেন, 'সত্য স্বয়ং প্রকাশ, তাকে কোন রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়। দোষ তার যিনি আমার কর্ণে তার বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাকে শাস্তি দেবার মত রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নেই। আমি সত্য রক্ষার ন্যায় উদ্ধারে বিশ্বপ্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক যতটুকু ক্ষমতা ছিল তার আদেশ পালন করছি। বিচারক জানে, আমি যা বলেছি, যা লিখেছি, তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়। ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবুও হয়তো সে শাস্তি দেবে। কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।'

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। আদালত থেকে যখন কবিকে গাড়িতে তোলা হয় তখন বিমর্ষ বন্ধু-বান্ধবদের সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেন, 'দুঃখ করিসনে ভাই' একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হয়তো এই কারাবাসের আমার দরকার ছিল। বিধাতার আমোঘ বিধান খণ্ডাবে কে। এর পিছনে আমি মঙ্গল মায়ের মঙ্গল হস্তই দেখতে পাচ্ছি।'

কারাবাসের প্রথম কিছুদিন নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। কবিগুরু তার 'বসন্ত' নাটিকা নজরুলকে উৎসর্গ করলে জেলে তা পৌঁছে দেয়া হয়। একটা সাধারণ 'কনভিক্ট'কে পোয়েট টেগোর বই 'ডেডিকেট' করেছেন একথা শুনে তাজ্জব বনে গেলেন জেলার ফিরিঙ্গি অফিসার আর পাহারাদার মহল। সসম্ভ্রমে তারা প্রশ্ন করলেন, 'ইজ হি রিয়েলি সো গ্রেট এ ম্যান? থ্যাঙ্ক হেভেন্স।' এরপর আলিপুর থেকে নজরুলকে বদলি করা হয় হুগলি জেলে। কিন্তু সেখানে কয়েদিদের ওপর নির্যাতনের আর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে কবি অনশন শুরু করেন। এ খবরে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। জেল কর্তৃপক্ষ নানা শাস্তির ব্যবস্থা করলো। ডাণ্ডাবেড়ি নির্জন কুঠুরিতেই কয়েদ- কিছুতেই কিছু হ'ল না। তার পর শুরু করলো ফোরসড ফিডিং। সেটি আরো যন্ত্রণাদায়ক। দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়েন কবি। এ খবরে কবির বন্ধু-বান্ধবরা ছোটাছুটি করে তার অনশন ভঙ্গের চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনভাবেই তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। দেশবন্ধু, হেমন্ত সরকার, অতুল সেন, মৃনাল কান্তি বসু, কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী প্রমুখ সকলে দাবি জানালেন নজরুলকে বাঁচানো বাংলাদেশ ও সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুল যাতে অনশন ভঙ্গ করে।

অবশেষে নজরুলের মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবী কারাগারে এসে নজরুলের অনশন ভঙ্গ করালেন। এ যাত্রায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে নজরুল-প্রেমীরা।

হুগলি জেল নজরুলকে অনেক কিছু দিয়েছে। যেমন, নজরুল হুগলির জেলে থাকাকালীন বহু তরুণ বিপ্লবী যুব ও ছাত্র সমাজ আন্দোলনের সৈনিকরূপে হুগলি বিদ্যামন্দিরে স্বেচ্ছাসেবকরূপে সমবেত হয়। হুগলি জেল তখন বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক বন্দীর সমাগমে গমগম করছিল। কবি নজরুলকে পেয়ে বন্দীরা গানে, আবৃত্তিতে ও হাসির হুল্লোড়ে হৈ-চৈ করে কাটাতো। বিচারক সুইনগো নিজে কবি হয়েও বিদ্রোহী কবির বেলাতে কোন শ্রেণী বিভাগ না করেই তাকে সাধারণ কয়েদিরূপে গণ্য করেছিল। ডোরাকাটা হাফ পাঞ্জাবি ওই কাপড়ের জের। আর ওই কাপড়েরই গামছার মতো গা মোছা চাদর, বিষম ফুটফুটে খোঁচা লোমের কম্বলসহ এই অপরূপ পোশাকে জেল কর্তৃপক্ষ বাংলার জাতীয় জাগরণের কবিকে সাজিয়ে কয়েদীর গাড়িতে ছেড়ে দিল। কোলকাতা থেকে হুগলি জেলে কবিকে আনা হয়েছিল কোমরে দড়ি বেঁধে। জেলখানায় ঢুকেই কবি উদাত্ত সুরে 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে হাঁক ছাড়লেন। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে উঠল বিদ্রোহী কবি নজরুল হুগলি জেলে পদার্পণ করেছেন। সকলেই কবির আগমনে বন্দীদশার একঘেয়েমিতে বৈচিত্রের অবস্থায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

কবির হুগলি জেলে অবস্থানকালীন নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। কবিকে পেয়ে বন্দীদের একঘেয়েমির অবসান ঘটে। বাইরে থেকে ছাত্রের দল হুগলি ব্রিজের উপরে উঠে জেলের কয়েদীদের দেখত এবং নানারকমে উৎসাহিত করতো বিপ্লবী তরুণ নেতা সিরাজুল হক, হামিদুল হক জনাদন প্রমুখ ব্রিজের উপর থেকে সুযোগ বুঝে কাপড়, গামছা, তোয়ালে, সাবান, বিড়ি-সিগারেট, খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিতেন। বন্দীরাও তাদের খবরাখবর পাঠাবার জন্য চিঠি প্রভৃতি ঢিলের সাথে জড়িয়ে ছুঁড়ে এদিকে পাচার করতেন। যতগুলো জেল ছিল তার মধ্যে হুগলি জেলটা সবচেয়ে উঁচু। এর জেলার যেমন অভদ্র, তেমনি অশিক্ষিত। চোর, ডাকাত, পকেটমারদের সাথে যে ব্যবহার করতো, বিশিষ্ট ও রাজনৈতিক বন্দীদের সাথেও সেই ধরনের ব্যবহার করতো। চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ তো দিতই না, কলম, পেন্সিলও অফিসে জমা নিয়ে নিতো তারা জোর করে। এ ব্যাপারে কবির মনটা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে হুগলি জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন এক ইংরেজ। নাম আর্সটিন। রাজনৈতিক বন্দীদের দেখলেই সে কারণে-অকারণে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতো। বন্দীরাও মজা দেখবার জন্য তাকে চটাবার আয়োজন করে রাখতো। কবি এই ইংরেজ জেল সুপারের নাম রেখেছিলেন 'ইসটোন'। মানে পিচেশ কণ্ঠী। কবি তাকে চটাবার জন্য 'সুপার বন্দনা' নামে একটি গান লেখেন। এই গান লেখার পর সরকার মনোনীত পত্রিকাগুলোও বন্ধ করে দিল আর্সটিন। শুধু তাই নয় পূর্বের নিয়ম ভেঙে বন্দীদের একটা ঘরে একজনকে, কোথাও দু'জনকে আটকে রেখে বাইরে বেড়ানোও বন্ধ করে দিল। বন্দীর সাথে বন্দীরা কথাও বলতে পারতো না। কবি নজরুল গান না গেয়ে থাকতেও পারতেন না। তিনি গান ধরতেন :

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী।
ওরে ওই তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।'

গানটি শুনে বিক্ষুব্ধ বন্দীদের শিরদাড়া সোজা হয়ে উঠতো। এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হতো। কবি এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দীকে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে সেলে বন্দী করে অন্যান্য কয়েদী থেকে দূরে

সরিয়ে রেখে দিল। কবি তখন শিকল পরার গান খানি রচনা করে হাতকড়া সেলে লোহার গারদের সাথে ঘা দিয়ে বাজিয়ে গাইলেন :

'এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরার ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।'

কাগজ নেই, কলম নেই, পেনসিল নেই। কবি শূন্য হাতে শুধু স্মৃতি শক্তির জোরে এইসব গান শত বাধা সত্ত্বেও রচনা করে সুর ও দরদ দিয়ে ভাবাবেগের সাথে গেয়ে যান প্রতিকারের জন্য। প্রতিরোধের জন্য ও উপযুক্ত প্রতিবাদের জন্য আগুনকে সংক্রমিত করে যেতে লাগলেন বন্দীদের প্রাণে প্রাণে। এই সময় বিখ্যাত 'সেবক' কবিতাটি রচনা করেন তিনি। উদাস কণ্ঠে আবৃত্তি করে তিনি বন্দীদের সংগ্রাম-শক্তি বাড়িয়ে তুলে ছিলেন। কবির সান্নিধ্যে এসে সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত দেশকে ভক্তি করতে শিখেছিল। ক্রমে জেলের অবস্থা খুব জোরালো হয়ে উঠলো। যত রকমের ফন্দি ছিল সবই প্রয়োগ করতে লাগলো জেল সুপার। অনমনীয় বন্দীরা, অনমনীয় বিদ্রোহী কবি, অনমনীয় সাধারণ কয়েদীরা। এই প্রতিবাদের জন্য লিখিতভাবে সবাই অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এ সময় কবি 'স্মরণ-বরণ' গান রচনা করেন। এছাড়াও 'বন্দী বন্দনা' নামে আরো একটি গান রচনা করেন। এরপর কবি ও সব বন্দী মিলে শুরু হলো অনশন ধর্মঘট। এ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বাংলায় ও নিখিল ভারতের নরম ও চরমপন্থী নেতা ও ছাত্র-যুবকরা এমনকি সাধারণ মানুষও ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও খুব বিচলিত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় বিরোজা সুন্দরী এলেন গুগলি জেলে। কবি তাকে মাতৃসম শ্রদ্ধা করতেন। তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। কবি তার হাতে লেবুর রস পান করে অনশন ভঙ্গ করেন। এরপর কবিকে বহরমপুর জেলে বদলী করা হয়। কবি উক্ত জেলে যেতেই জেল সুপারিনটেনডেন্ট বসন্ত ভৌমিক একটি হারমোনিয়াম তাকে পাঠিয়ে দেন। হারমোনিয়াম পেয়ে নজরুলের আনন্দ আর ধরে না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত গান গাইতেন। আর মনের সুখে কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন।

নজরুলের কারাবরণ বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। কারাজীবনে কবি উল্লেখযোগ্য বহু গান, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেন, যা একদিকে বাংলা সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি মুক্তিসংগ্রামী আপামর জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

'মেডিকেল পলিটিক্স' ও নজরুল দম্পতির চিকিৎসা' শিরোনামে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ এস.এম. লুৎফর রহমান সম্প্রতি যা লেখেন, তার সারকথা এই যে,

মেডিকেল কন্সপিরেসীর শিকার হয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্ব-ব্যক্তিত্বদের মধ্যে যুদ্ধবন্দী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, যাকে একটু একটু করে আর্সেনিক বিষ খাইয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নকে বাগে আনার জন্য বৃটিশরা ক্রুশ্চেভের মাধ্যমে ডাক্তারদের দিয়ে বিষ ঔষধ প্রয়োগ করে স্ট্যালিনকে হত্যার চেষ্টা করে। ইয়াসির আরাফাতকে ইস্রাঈলী চররা বিষ ঔষধ খাইয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। এর সর্বশেষ নযীর হ'ল (ইসলাম গ্রহণকারী) বিশ্বখ্যাত আমেরিকান পপ তারকা মাইকেল জ্যাকসন। একইভাবে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ও তাঁর পত্নী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মেডিকেল কনস্পিরেসির শিকার কি-না তা দেখা যেতে পারে। কারণ ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হবার পর সারা দেশের পরিবেশ পাল্টে যায়। তখন 'মুসলিম' বনাম 'হিন্দু' ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪২ সালের ৮ই জুলাই কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব পাস হবার পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভারতব্যাপী মুসলমানদের উপর হিন্দুদের হামলা শুরু হয়। মুসলমানদের বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট লুট করা হয় ও তাতে আগুন দেওয়া হয়। মুসলমান পুলিশ ও দারোগাদের হত্যা করা হয়। ঠিক ওই সময় কবি নজরুল অসুস্থ হন ও (বাকরুদ্ধ হন) এবং ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাই এতে মেডিকেল পলিটিক্স-এর প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকা বিচিত্র নয়।

(ইনকিলাব ২৫-৫-২০১২)

হাদীছের গল্প

কবর আযাবের কতিপয় কারণ

মৃত্যুর পরে মানুষকে কবরে রাখা হয়। বিভিন্ন কারণে মানুষকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে মিথ্যা বলা, কুরআন তেলাওয়াত পরিহার করা, সূদ খাওয়া ও যেনা-ব্যাভিচার করা অন্যতম। এ প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত হাদীছ।-

সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের ছালাত শেষে প্রায়ই আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর (ব্যাখ্যা) করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সম্মুখের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায়। সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হ'লাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হ'তে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'ত। আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হ'ত, তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সুতরাং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হ'লাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হ'তে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখ লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বাইরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। এ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যা সে প্রজ্জ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হ'তে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়ালো এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হ'তে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, (আমরা তা জানাবো)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হ'তে মিথ্যা রটানো হ'ত। এমনকি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মাথা পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হ'তে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হ'ল যেনাকারী (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হ'ল সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)। আর তাঁর চতুষ্পার্শ্বে শিশুরা হ'ল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হ'ল দোযখের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর যে ঘর পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হ'লাম, জিব্রাঈল এবং ইনি হ'লেন, মীকাঈল। এবার আপনি মাথা উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তরবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, তা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন' *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪১৬)*। মানুষকে মৃত্যুর পর থেকে ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কবরে অবস্থান করতে হবে। কবরে তার আমল অনুসারে শান্তি বা শাস্তি দেওয়া হবে। তাই মৃত্যুর পূর্বেই আমাদেরকে সতর্ক-সাবধান হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

চিকিৎসা জগৎ

হাঁটুর জোড়ার রোগে আর্থোস্কোপি

হাঁটু শরীরের বড় জোড়াগুলোর মধ্যে একটি এবং শরীরের ওযন বহন করার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। জোড়ার বিভিন্ন ধরনের রোগ ও ইনজুরিতে হাঁটু আক্রান্ত হয় বেশী। হাঁটু তিনটি হাড়, চারটি লিগামেন্ট ও দুইটি মেনিসকাস সমন্বয়ে গঠিত। জোড়ার ভেতর ও বাহিরের গুরুত্বপূর্ণ লিগামেন্টগুলো জোড়াকে সুরক্ষা করে এবং দৈনন্দিন হাঁটুর বিভিন্ন নড়াচড়ায় সহায়তা করে। মেনিসকাস দুই হাড়ের মাঝখানে অবস্থান করে শরীরের ওযন সমভাবে বিতরণ করে এবং হাড়কে ঘর্ষণ হ'তে রক্ষা করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির এ যুগে হ'লেও আমাদের দেশে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসা সীমিত আকারে শুরু হয়েছে। হাড় ও জোড়ার চিকিৎসার এক সফল ও কার্যকর সমাধান এনেছে বিস্ময়কর আর্থোস্কোপিক সার্জারি। এটি হ'ল আর্থোপেডিক চিকিৎসায় বর্তমান যুগের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক পদ্ধতি। ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে ক্যামেরা যুক্ত যন্ত্র (স্কোপ) জোড়ায় প্রবেশ করিয়ে এবং যন্ত্রের সাথে যুক্ত বাহিরে টিভি স্ক্রিন বা মনিটর দেখে অপারেশন করা হয়।

হাঁটুর রোগের লক্ষণসমূহ :

মাঝে মধ্যে হাঁটু ফুলে যায় আবার স্বাভাবিক হয়। ব্যথা হয় এবং নড়াচড়ায় ব্যথা বেড়ে যায়। অনেকক্ষণ হাঁটু ভাঁজ করে বসার পর হাঁটু সোজা করা যায় না; এদিক-ওদিক নড়াচড়া করে হাঁটু সোজা করতে হয়। হাঁটু সম্পূর্ণ ভাজ বা সোজা করা যায় না।

জয়েন্ট ছুটে যাবে বা ঘুরে যাবে এরকম মনে হয়, বিশেষ করে অসমতল জায়গায় হাঁটলে। সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করতে এবং বসা থেকে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। হাঁটু ভাজ ও সোজা করলে মনে হয় কিছু একটা জোড়ায় ঢুকছে এবং বের হচ্ছে। প্যাটেলা বা নিক্যাপে ব্যথা এবং হাঁটু ভাজের সময় আংশিক বা সম্পূর্ণ স্থানচ্যুতি হয়।

আর্থ্রোস্কোপিক চিকিৎসা :

ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ইনজুরির ক্ষেত্রে নতুন লিগামেন্ট পুনঃস্থাপন করা হয়। মেনিসকাস ইনজুরি হ'লে রিপেয়ার বা সেলাই করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে সেভিং করা হয় এবং টুকরো অংশ বের করা হয়। ওসটিওফাইট (নতুন হাড়) হাড় ও তরুণাস্থির আলাদা অংশ এবং লুজ বডি রিমোভ করা হয়। সাইনোভিয়াল বায়োপরি ও ওয়াশআউট আর্থাস্কোপি দিয়ে করা হয়। প্যাটেলা বা নি-ক্যাপ পুনঃস্থাপন ও লিগামেন্ট তৈরী করা হয়। জোড়ার সমস্যা কনজারভেটিভ বা মেডিকেল চিকিৎসায় ভাল না হ'লে এবং যে ক্ষেত্রে আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারি প্রথম থেকেই প্রয়োজন সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আর্থ্রোস্কোপিক সার্জনের পরামর্শ নেয়াই শ্রেয়। আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারির পর নিয়মিত এবং উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

দেহ গঠনে প্রোটিনযুক্ত খাবার

আমাদের শরীরের প্রধান উপাদান অ্যামাইনো এসিড। এই অ্যামাইনো এসিড থাকে প্রোটিনের মধ্যে। সুতরাং প্রোটিন হচ্ছে এক ধনের অ্যামাইনো এসিড যা দেহ গঠন ও কোষকলা তৈরিতে সাহায্য করে। সেজন্যই প্রোটিনের এত কদর, এত গুরুত্ব। প্রোটিন প্রধানত দুই রকমের। যথা : প্রাণিজ প্রোটিন- দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি; উদ্ভিজ প্রোটিন- চাল, ডাল, শিম, সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদি। শরীর গঠনের জন্য মোট ২২ রকমের অ্যামাইনো এসিড লাগে। এসব অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে মানুষের শরীর থেকে তৈরী হয় ১৩ রকমের অ্যামাইনো এসিড। বাকি ৯ ধরনের অ্যামাইনো এসিড শরীর তৈরী করতে পারে না। এগুলো খাবারের মাধ্যমে শরীরে আসে। এই ৯টি অ্যামাইনো এসিডকে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো এসিড বলা হয়। ডিম, মাছ, গোশত আর দুধে অর্থাৎ প্রাণিজ প্রোটিনে সবগুলো এসেনশিয়াল অ্যামাইনো এসিড থাকে। সেজন্যই এসব খাবারকে ফার্স্ট ক্লাস কমপ্লিট প্রোটিনের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে চাল, গম, ডাল, শাকসবজি ও ফলে সবক'টি এসেনশিয়াল অ্যামাইনো এসিড এক সাথে পাওয়া যায় না। তাই এসব নিরামিষ খাবার-দাবারকে এতদিন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাবারের পর্যায়ে ফেলা হ'ত। প্রাণিজ প্রোটিনের মূল্য বেশী হওয়ায় বিধাতা গরিবদের জন্যও অল্পমূল্যে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দেখা গেছে দু'তিনটি নিরামিষ খাবার ঠিক মাত্রায় একত্রিত করে রান্না করলে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় চাল ও ডাল একসাথে খিচুড়ি রান্না করে খেলে বা ডাল-ভাত সবজি একত্রে খেলে তা কোন অংশেই মাছ-ভাত বা গোশত-ভাতের চেয়ে কম হবে না। একইভাবে সয়াবিনের তরকারি, অন্যান্য সবজি ও রুটি খেলে উচ্চমানের প্রোটিনই শরীরে যাবে। পুষ্টিমান বিচার করে দেখা গেছে গোশত ও মসুর ডালের পুষ্টিমূল্য প্রায় সমান সমান। সব থেকে মজার ব্যাপার হ'ল মাছ-গোশতের চেয়ে দুধের নেট প্রোটিন ইউটিলাইজেশন বা NPU অনেকটাই বেশী। যেমন- মাছ ও গোশতের NPU যথাক্রমে ৭৮ ও ৭৬, সেই তুলনায় দুধের ৮৫। বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন খাবারের মধ্যে দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যের প্রোটিন উৎকৃষ্ট। দুধ থেকে তৈরী দই অত্যন্ত উপকারী। দইয়ের প্রোটিন সহজেই হজম হয়। সয়াবিন থেকেও দুধ, দই, ছানা ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। যার পুষ্টিমান গরুর দুধ, দইয়ের কাছাকাছি। শিশু-বৃদ্ধ সবার দেহের গঠন এবং ক্ষয় পূরণের জন্য প্রোটিন অত্যন্ত যরূরী উপাদান। প্রোটিন জাতীয় খাদ্য খাওয়ার পর তা পাকস্থলীতে পাচক রসের সাহায্যে ভেঙ্গে অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়, যা শোষণের পর রক্তে বাহিত হয়ে প্রতিটি কোষের পুষ্টি যোগায়। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা ৬০ গ্রাম অথবা প্রতি কেজি ওযনের জন্য ১ গ্রাম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি পাউন্ড ওযনে ০.৫ গ্রাম ধরে দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে হবে। এ সময় প্রোটিনের অভাব হ'লে শিশুর কোয়াশিওরকার বা ম্যারাসমাসের মতো অপুষ্টির শিকার হ'তে পারে। গর্ভাবস্থায় এবং প্রসূতি মায়েদের প্রোটিনের চাহিদা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী। তাই দেহ গঠন এবং ক্ষয় পূরণের জন্য আমাদের দৈনিক চাহিদামাফিক প্রোটিনযুক্ত খাবার গ্রহণ করা উচিত।

॥ সংকলিত ॥

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১২

প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. অর্থসহ বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীছ মুখস্থকরণ :

❖ কুরআন তেলাওয়াত : নির্বাচিত সূরা সমূহ (ক) সূরা ফাতিহা (খ) সূরা আছর (গ) সূরা ইখলাছ (ঘ) সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ নং আয়াত।

❖ হাদীছ মুখস্থকরণ : (সোনামণি কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. আক্বীদা : (সোনামণি কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত আক্বীদা বিষয়ক ২৭ টি প্রশ্নোত্তর)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

ক. 'জ্ঞানকোষ-১'-এর সাধারণ জ্ঞান (১-৫০নং প্রশ্ন), ইসলামী জ্ঞান (১-৫০নং প্রশ্ন), রহস্য, একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা এবং কবিতা (সোনামণির ইচ্ছা)।

খ. 'জ্ঞানকোষ-২'-এর ইসলামী জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান (রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ), দৈনন্দিন বিজ্ঞান, শিশু অধিকার ও সংগঠন বিষয়ক।

৪. সোনামণি জাগরণী : (সোনামণি কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচটি জাগরণী)।

৫. ছবি অংকন : মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পাহাড়, ঝর্ণা, অপরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী (প্রাণী বিহীন)।

❑ **আবশ্যকীয় বিষয় :** ছালাত সম্পর্কিত দো'আ সমূহ (সোনামণি কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

প্রতিযোগীদের জ্ঞাতব্য :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার পূর্ণমান হবে ১০০। তন্মধ্যে উন্মুক্ত বিষয়ে ৭৫ ও আবশ্যকীয় বিষয়ে ২৫ নম্বর প্রদান করা হবে। (উল্লেখ্য যে, মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলোতে তিনজন বিচারকের প্রত্যেকে আলাদাভাবে পূর্ণমান ২৫ এর মধ্যে নম্বর প্রদান করবেন)।

২. প্রতিযোগীদের অবশ্যই জ্ঞানকোষ-১ (তৃতীয় সংস্করণ) ও জ্ঞানকোষ-২ (প্রথম সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে এবং ভর্তি ফরম পূরণ করতে হবে এবং স্ব স্ব যেলা পরিচালক **'সোনামণি'**-এর সুপারিশপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

৩. প্রত্যেক প্রতিযোগী অনধিক ৩টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে সর্বক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বিষয়ে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক থাকবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, এলাকা, উপযেলা, মহানগরী ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন বিচারক মনোনীত হবেন।

৭. প্রতিযোগিতার বিষয়াবলীর ক্রমিক নং ১, ২, ৪ ও আবশ্যকীয় বিষয় মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

৮. বয়স প্রমাণের জন্য প্রত্যেক সোনামণিকে স্ব-স্ব জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে (যদি থাকে)।

৯. ক্রমিক নং ৫-এর ছবি অংকনের জন্য আর্ট পেপারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে এবং যেলার বাছাইকৃত তিনজনের তিনটি ছবি সাথে আনতে হবে।

১০. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদেরকে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র ও শুধুমাত্র আর্ট পেপার কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহ করা হবে; তবে অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

১১. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে মাত্র ২০ (বিশ) টাকা পরীক্ষার ফি প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১২. স্ব স্ব শাখা, এলাকা, উপযেলা, মহানগরী ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা, এলাকায়, এলাকা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১৪. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হবে এবং পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১৫. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগী সোনামণিকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১৬. প্রতিযোগিতার সকল ক্ষেত্রে **'সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১২'**-এর পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. স্ব স্ব শাখায় : ১৪ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

২. স্ব স্ব উপযেলায় : ২১ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

৩. স্ব স্ব যেলায় : ২৮ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে : ১১ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩ টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

আয়োজনে : **'সোনামণি'** একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস্-সালাফী (৩য় তলা), নওদাপাড়া (আমচত্বর)
সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩।

কবিতা

রামাযানের শিক্ষা

আতিয়ার রহমান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আসলো ছিয়াম শিক্ষা দিতে মোদের দ্বারে রামাযানে,
ছিয়াম সাধনায় শিক্ষা নিতে পারবে কি তাই সবজনে?
আল্লাহভীতি দিবা-রাত্রি সর্ব কাজে যার দিলে,
সেই তো পারে শিক্ষা নিতে বসতে ছাওমের মসনদে।
ছিয়াম সাধনার পরেও যাদের আল্লাহভীতি জাগলো না,
শয়তানী আর বদ খাছলাত মোটেও দূর হ'ল না।
সবটা জীবন থাকলো যে জন আযাযিলের পাশেতে,
রামাযানের ঐ ছিয়াম সাধনা লাগবে তাহার কোন খাতে?
শয়তানের ঐ আদেশ মেনে কাটলো যাহার সবটি কাল,
কেমনে হবে তাদের বলো ছিয়াম সাধনা পাপের ঢাল?
সন্ত্রাসী আর দুর্নীতিবাজ তারাও আজি রামাযানে,
আল্লাহ্‌র খুশী পাইতে তারা দু'হাত ভরে দান করে।
পায় যদি ফের শিক্ষা তারা তওবা করে ফিরতে চায়,
রামাযানেরই শিক্ষা তারা শক্ত করে বক্ষে নেয়।
হইলে খুশী তওবাতে তোর মহান রহীম রহমান,
করতে পারেন তোকে হেথায় তাঁহার অসীম রহম দান।
রামাযানেতে শিক্ষা পেলাম আল্লাভীতি অন্তরে,
সঠিক রাহে চলবো এবার কাঁদবো এবার তাঁর দ্বারে।
চলবো এবার মুত্তাক্বীদের সংগে আমি দল বেঁধে,
পড়বো না আর আযাযিলের বিশ্বে পাতা ঐ ফাঁদে।
আল্লাহ্‌র পথে চলবো এবার ছিয়াম সাধনার শিক্ষা নে,
এটাই হ'ল সঠিক শিক্ষা ত্রিশ দিনের রামাযানে।

***

হে ছায়েম! ছাড় এ মাসে

আব্দুল খালেক খান
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

হে ছায়েম! ছাড় এ মাহে,
মিথ্যা, গীবত, তোহমত
যেনা, চুরি, অপবাদ,
হারাম রূযীর উদর মাৎ
সূদ-ঘুষ সব থাক তফাৎ।
হে ছায়েম! ছাড় এ মাহে,
কড়ির মোহে মিথ্যা সাক্ষ্য
অশালীন কথা ও কটু বাক্য
বেচা-কেনায় কম-বেশী
খেও না বিষ গলায় রশি।
হে ছায়েম! ছাড় এ মাহে,
গাজা, ফেনসিডিল, হেরোইন,
তাস, দাবা, কেরাম বীন
বিএফ, ভিসিআর, নগ্ন ছবি,
মারামারি আর খুন খারাবি।
হে ছায়েম! ছাড় এ মাহে
বেহায়ার মত চলা ফেরা,
বিনা পর্দায় ঘর ছাড়া
ফাকির মত চিন্তা ধারা
বিড়ি, সিগারেট, গুল মারা।
হে ছায়েম! ছাড় এ মাহে
ভালবাসার প্রেমপত্র,
বিনা কাজে গেও না গো
হৃদয় তোষণে নারীর গান
তবেই তোমায় সইতে হবে
লাঞ্ছনা ও অপমান।

***

ছিয়ামের শিক্ষা

ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাপ উদ্দীন মিয়া
ওছমানপুর বাজার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

শিক্ষা নেই ছিয়াম হ'তে
কত বড় ক্ষুধার জ্বালা,
এজন্যই মোদের তরে ছিয়াম
ফরয করেন আল্লাহ তা'আলা।
উপোষ করি নিজে স্বয়ং
খাওয়াই যদি ভাইকে আপন,
ক্ষুধার্তের কত জ্বালা
বাস্তবে বুঝব তখন।
রিয়াজত ও নফস যদি
রাখতে পারি আল্লাহ্‌র পথে
জান্নাতের বাগানে গিয়ে
ফল খাব ইচ্ছামতে।

***

রামাযান

শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

পুণ্যের সমীর বইয়ে দিতে
এল মাহে রামাযান
মুসলিম উম্মতের মাঝে
বইছে আনন্দের বান।
সহস্র মাসের অধিক পুণ্য
এমাসের এক রাতে
ছিয়াম রাখব ছালাত পড়ব
পুণ্য লাভের আশে।
সারা বছর খারাপ কাজ
আর করেছি যত পাপ
রামাযানে ছিয়াম রেখে
করিয়ে নেব সবই মাফ।
দু'হাত তুলে প্রভুর নিকট
করব ফরিয়াদ
ছিয়াম রাখছি তোমার ভয়ে
পাপ হ'তে করে দাও আযাদ।
অফুরন্ত পুণ্য নিয়ে
এল মাহে রামাযান
সবাই মিলে রাখব ছাওম
এই করেছি পণ।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচীকে।
২। সরন্দীপ বা শ্রীলংকাকে (আদম (আঃ)-এর অবতরণ স্থল।)
৩। ভারতের গুজরাটকে।
৪। মক্কা থেকে মুহাদ্দিছগণ এখানে আগমন করেন বলে।
৫। চট্টগ্রাম বন্দরকে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী) :

১. ফেরাঊন কে?
২. ফেরাঊন কোন নবীর সাথে সম্পর্কিত?
৩. মূসা (আঃ) কয়জন ফেরাঊনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন?
৪. ডুবে মরা ফেরাঊনের আসল নাম কি ছিল?
৫. সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ফেরাঊনের লাশ কবে আবিস্কৃত হয় এবং তা কোথায় রক্ষিত আছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) :

১. এক্স-রে মেশিনের কাজ কি?
২. আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন কি কাজে ব্যবহৃত হয়?
৩. ইসিজি-এর কাজ কি?
৪. কোন যন্ত্রের সাহায্যে রক্তপাত ছাড়াই কঠিন অস্ত্রপচার করা হয়?
৫. ডায়বেটিস-এর মহৌষধ কি?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

বটতলী বাজার, জয়পুরহাট ২০ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলা ক্ষেতলাল থানাধীন বটতলী বাজারস্থ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যেলা কার্যালয়ে এক 'সোনামণি' সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মুনায়েম হুসাইনকে পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'-এর উপদেষ্টা আমীনুল ইসলাম।

পাজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ১লা মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব পাজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। অন্যান্যের মধ্যে যেলা 'আন্দোলন'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

ক্ষুদ্র জামিরা, চারঘাট, রাজশাহী ১৯ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ক্ষুদ্র জামিরা সোনাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবু সাঈদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক খুরশেদ আলম।

আশাশুনি, সাতক্ষীরা ২৯ মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর বুধহাটা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আশাশুনি উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক হাবীবুল্লাহ বাহার-এর সভাতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব কেরামত আলী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাওলানা শফিউল আলমকে পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' আশাশুনি উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সোনামণি যেলা পরিচালক হাফীযুর রহমান।

অধম মানুষ

হুরমা খাতুন
গড়ের কান্দা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

জন্ম নিয়েছি পৃথিবীতে
হয়েছি সৃষ্টির সেরা মানুষ
দুনিয়ার মোহে হয়েছি বিভোর
এখনও আমার ফেরেনি হুঁশ।
হালাল-হারাম দেখলাম না
খাইলাম প্রাণ ভরে।
শিরক-বিদ'আত মানলাম না
পুণ্যের আশা করে।
আপন-পর চিনলাম না
স্বার্থের লোভে পড়ে
ছালাত-ছিয়াম করলাম না
শয়তানের দলে ভীড়ে।
সূদ-ঘুষ ছাড়লাম না
দেশে চলছে বলে
ওশর-যাকাত দিলাম না
অর্থ কমে যাবে বলে।
গান-বাজনা ছাড়লাম না
শুনলাম বিভোর হয়ে,
কুরআন-হাদীছ পড়লাম না
থাকলাম টিভি-ভিসিআর নিয়ে।
প্রতিবেশীর সঙ্গে মিশলাম না
মূর্খ ও গরীব তাই
আত্মীয়তা ছিন্ন করলাম
পরিচয় দিতে লজ্জা পাই।
সৃষ্টির সেরা জীব হ'লেও আমি
হ'তে পারিনি আসল মানুষ,
কর্ম আমারে নামিয়েছে নীচে
হয়েছি তাই অধম মানুষ।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দুর্নীতি দেশের সব জায়গায়

-অর্থমন্ত্রী

দেশের সর্বত্রই দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে বলে স্বীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত। তিনি বলেন, 'দেশের সব জায়গায় দুর্নীতি। বিচার প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, কর আদায়কারী সংস্থা থেকে শুরু করে থানা পর্যন্ত এই দুর্নীতি বিস্তৃত। দেশে সুশাসন না থাকার অন্যতম দুই কারণ হচ্ছে দুর্নীতি এবং আইনের শাসনের অভাব'। গত ১৯ মে অর্থমন্ত্রী এক গোলটেবিল বৈঠকে এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, 'আমি আরো বিশ্বাস করি যে দেশের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এ দু'টি খাত ব্যাপক দুর্নীতিগ্রস্ত'।

বাংলাদেশে কালো টাকা জিডিপির ৩৭ শতাংশ

বাংলাদেশে কালো টাকার হার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩৭ শতাংশ। এই হিসাবে কালো টাকার পরিমাণ প্রায় এক লাখ ৪৩ হাযার কোটি টাকা। অস্ট্রিয়ার জোহান্স কেপলার ইউনিভার্সিটি অব লিনজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্নাইডারের গবেষণায় বাংলাদেশের কালো টাকার এই পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'বিশ্বব্যাপী ছায়া অর্থনীতি : ১৬২টি দেশের নতুন হিসাব' নামের এই গবেষণা গত বছর প্রকাশিত হয়। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে কালো টাকা জিডিপির সর্বনিম্ন ৪৬ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ৮১ শতাংশ। এই হিসাবে বাংলাদেশের কালো টাকার পরিমাণ সর্বনিম্ন এক লাখ ৭৭ হাযার ৪৭ কোটি টাকা এবং সর্বোচ্চ তিন লাখ ১০ হাযার ৯৮৭ কোটি টাকা।

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে চুনাপাথরের খনির সন্ধান লাভ

'বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর' (জিএসবি) ধারণা করছে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় যেলা জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে আবিস্কৃত খনিতে বড় ধরনের চুনাপাথরের মজুদ রয়েছে। তিন মাসেরও বেশী সময় ধরে খনন কাজ চালিয়ে গত ২ জুন এই খনিতে চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া যায়। গত এপ্রিলে ভূতাত্ত্বিক জরিপের ভিত্তিতে জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে অবস্থিত এই খনি এলাকায় অনুসন্ধান কূপ খনন শুরু করেছিল জিএসবি। এর আগে জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের টেকেরহাট এলাকাতেও চুনাপাথরের সন্ধান পেয়েছিল জেএসবি। পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এই দু'টি প্রকল্প থেকে চুনাপাথর উত্তোলন লাভজনক হবে না বলে জানানো হয়েছিল। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মুনিরা আক্তার চৌধুরী জানান, ভূপৃষ্ঠ থেকে ১ হাযার ৪৯৮ ফুট গভীর পর্যন্ত খনন শেষে চুনাপাথরের বড় মজুদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এই খনির পুরুত্ব হবে প্রায় একশ' ফুট। তিনি জানান, চুনাপাথরের এ খনি অঞ্চলটি দৈর্ঘ্যে ১২ কিলোমিটার ও প্রস্থে ৮ কিলোমিটার।

সিপিডির মূল্যায়ন

তিন বছরের মধ্যে দেশের অর্থনীতির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ

সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। সম্প্রতি উৎপাদন ও রফতানীতে প্রবৃদ্ধি কমেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্তবায়নে বিরাজ করছে বেহাল দশা। সরকারের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনায়ও বড় ধরনের ত্রুটি রয়েছে। এতে সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো বড় ধরনের চাপে পড়েছে। এসব বিবেচনায় চলতি অর্থবছরকে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে দুর্বলতম বছর হিসাবে অভিহিত করেছেন বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগে'র (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, রেন্টাল ও কুইক রেন্টালে বিশাল ভর্তুকির কারণে দেশের অর্থনীতির অবস্থা নাজুক। আগামী অর্থবছরেও সরকার ভর্তুকির ধারা থেকে বের হতে পারবে না। এতে আগামী অর্থবছর হবে অর্থনীতির বিপর্যয়ের বছর।

২০১২-১৩ অর্থবছরের বিশাল বাজেট

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত গত ৭ জুন জাতীয় সংসদে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য ১ লাখ ৯১ হাযার ৭৩৮ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পেশ করেছেন। প্রস্তাবিত বাজেট চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ৩০ হাযার ৫৩৫ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ বেশী। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রায় ৬ হাযার কোটি টাকার বৈদেশিক অনুদানসহ সরকারের সর্বমোট আয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৪৫ হাযার ৭১৪ কোটি টাকা। সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছে ৫২ হাযার ৬৮ কোটি টাকা (অনুদান ব্যতীত), যা জিডিপির ৫ শতাংশ। বাজেটে স্থানীয়ভাবে মোট রাজস্ব আয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লাখ ৩৯ হাযার ৬৭০ কোটি টাকা। যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ২০ হাযার কোটি টাকা বেশী এবং বার্ষিক মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রায় সাড়ে ১৩ শতাংশ। এর মধ্যে এনবিআরের রাজস্ব দেখানো হয়েছে ১ লাখ ১২ হাযার ২৫৯ কোটি টাকা। এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব ৪ হাযার ৫৬৫ কোটি এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ২২ হাযার ৮৪৬ কোটি টাকা। বাজেটের ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস থেকে ২০ হাযার ৩৯৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৩৩ হাযার ৪৮৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.১ শতাংশ) ঋণ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ২৩ হাযার কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.১ শতাংশ) এবং ব্যাংকবহির্ভূত খাত থেকে ১০ হাযার ৪৮৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১ শতাংশ) নির্বাহের সংস্থান রাখা হয়েছে। বাজেট ব্যয়ের মধ্যে এবার খাতওয়ারী সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রাখা হয়েছে জনপ্রশাসন খাতে ১৪ শতাংশ। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ২৪ হাযার ১১১ কোটি টাকা। দেশী-বিদেশী ঋণের সূদ পরিশোধে ব্যয় হবে বাজেটের ১২ দশমিক ২ শতাংশ। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১১ শতাংশ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবে আগামী অর্থবছরে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতির সর্বোচ্চ হার সাড়ে ৭ শতাংশ।

যেসব জিনিসের দাম কমতে পারে :

যেসব জিনিসের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো হ'ল ভোজ্যতেল, মোটরসাইকেল, বিদেশী রেফ্রিজারেটর, বিস্কুট, চানাচুর, লজেন্স, সাবান, জুতা ও স্যান্ডেল, সার ও কৃষি উপকরণ প্রভৃতি। তবে প্রকৃত বাজারচিত্র পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যেসব পণ্যের দাম কমার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর দাম কমেনি। বরং ব্যবসায়ীরা মজুদ করে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

যেসব জিনিসের দাম বাড়তে পারে :

যেসব জিনিসের দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো হ'ল সিগারেট, গাড়ি, এয়ার কন্ডিশনার, বৈদ্যুতিক পাখা, বিভিন্ন ফল, বিদেশী সিরামিক পণ্য, আমদানী করা পানি প্রভৃতি।

দেশে ৩ কোটি ৬৮ লাখ মানুষ নিরক্ষর

দেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৩ কোটি ৬৮ লাখ মানুষ নিরক্ষর। গত ২ জুন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস মিলনায়তনে মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ এর ৩ সাইকেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমীন এ তথ্য দেন।

বিদেশ

ভারতে প্রতিদিন ৩২ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায়

এক সমীক্ষায় জানা গেছে, ভারতে প্রতিদিন ৩২ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায়। ভারতে অনাহারী এবং অপুষ্টির শিকার লোকদের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার সমান। ভারতে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ৪২ শতাংশেরই ওযন কম। এ সংখ্যা সাব-সাহারান আফ্রিকার প্রায় দ্বিগুণ। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, অপুষ্টিকর খাবার গ্রহণের কারণে সৃষ্ট রোগব্যাধিতে ভারতে দৈনিক ৩ হাযার শিশু মারা যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, পুরো জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নিলে ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ বা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই অপুষ্টির শিকার। ২০১১ সালের 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স' অনুযায়ী পৃথিবীর ৮৭টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ৬৭তম। ভারতের অবস্থা দুর্ভিক্ষপীড়িত রুয়ান্ডার চেয়েও খারাপ।

ভারতীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান নন্দী ফাউণ্ডেশনের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারত স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির মাত্র ১.২ শতাংশ ব্যয় করে থাকে। এটা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে কম। ভারতের মধ্যপ্রদেশের চিত্র সবচেয়ে ভয়াবহ। এখানে প্রতি ১ হাযার শিশুর মধ্যে ৫ বছর হওয়ার আগেই ১০৩টি শিশু মারা যায়। ইউনিসেফের হিসাবে, ভারতে ৫ বছর হওয়ার আগেই ১ হাযার শিশুর মধ্যে ৬৬ জন মারা যায়।

[অথচ ভারতেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের বাস। পৃথিবীর ১ম ও ২য় ধনী ব্যক্তি ভারতের। ভারতের টাটা-বিড়লা, মিত্তাল, সাহারা প্রভৃতি ব্যবসায়ী গ্রুপ বিশ্বসেরা ব্যবসায়ী গ্রুপ বলে পরিচিত। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও তার সহযোগী গণতান্ত্রিক রাজনীতির এটাই হল বাস্তব পরিণতি। ভারত হ'ল বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। আর এদেশটিই তাদের জনগণের রক্ত চুষে হাড্ডিসার করে দিচ্ছে। দিন দিন ফুলে স্ফীত হচ্ছে হাতে গণা কয়েকটি ব্যবসায়িক গ্রুপ। অবাধ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দর্শনই এজন্য দায়ী। অথচ প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার। যা কেবল ইসলামী অর্থনীতিতেই সম্ভব (স.স.)]

এক-তৃতীয়াংশ বিয়ে বিচ্ছেদের কারণ ফেইসবুক

সারা বিশ্বের মোট বিয়ে বিচ্ছেদের এক তৃতীয়াংশ ঘটনার জন্য সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ফেইসবুককে দায়ী করা হচ্ছে। সম্প্রতি ৫ হাযার বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন পর্যালোচনা করে ব্রিটিশ আইনি সংস্থা 'ডিভোর্স অনলাইন' একথা জানিয়েছে। তাদের সমীক্ষায় দেখা যায়, গত বছরে ঘটা বিয়ে বিচ্ছেদের ৩০ শতাংশের বেশী কারণ হিসাবে ফেইসবুকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ২০০৯ সালে এ হার ২০ শতাংশ ছিল। আমেরিকান একাডেমী অব ম্যাট্রিমোনিয়াল লইয়ার্স'র তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের ৮০ শতাংশ অ্যাটর্নির মতে, সামাজিক নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত বিয়ে বিচ্ছেদের হার অনেক বেড়েছে।

মার্কিন সেনাবাহিনীতে প্রতিদিন ১ জন করে সৈন্য আত্মহত্যা করছে

মার্কিন সেনাবাহিনীতে এ বছর আত্মহত্যার হার খুব বেড়ে গেছে। প্রতিদিন গড়ে একজন করে মার্কিন সেনা আত্মহত্যা করছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর পেন্টাগনের এক পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে। পেন্টাগন জানায়, এ বছরের ৩ জুন পর্যন্ত কর্তব্যরত সেনাদের মধ্যে ১৫৪ জন আত্মহত্যা করেছে। গত বছর এ সময় পর্যন্ত আত্মহত্যা করে ১৩০ সেনা। একই সময় মার্কিন যুদ্ধসেনার মৃত্যুর হারের চেয়ে এই হার অনেক বেশী। যেসব সেনা বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী বলে পেন্টাগন জানায়। আত্মহত্যার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে- রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, যুদ্ধোত্তর মানসিক পীড়ন, ওষুধের অপব্যবহার এবং ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে।

বিশ্বে তরুণ বেকারের সংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মুখে চাকরির বাজারে দেখা দিয়েছে ব্যাপক মন্দা। 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন' (আইএলও)-এর তথ্য মতে, বিশ্বে এখন কর্মক্ষম তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার প্রায় ১৩ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্বে এই মুহূর্তে সাড়ে সাত কোটি তরুণরেই আক্ষরিক অর্থে কোন কাজ নেই।

কার্বন নির্গমনে চীন শীর্ষে

গত বছর বিশ্বে রেকর্ড পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়েছে। যাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন। প্যারিসভিত্তিক আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থা 'আইইএ' জানায়, প্রাথমিক হিসাবে গত বছর কার্বন নির্গমন ৩ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে ৩১ দশমিক ৬ গিগাটনে পৌঁছেছে। তাদের কার্বন নির্গমনের হার ৯ দশমিক ৩ শতাংশ হারে বাড়ছে।

বিশ্বের ৭৩ শতাংশ রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে

বিশ্বজুড়ে ৫০ হাযার টন রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে। ১৮৮ সদস্যের 'ইন্টারন্যাশনাল কেমিক্যাল ওয়েপন্স কনভেনশন' একথা জানিয়েছে। এ পরিমাণ বিশ্বে মোট মজুদের ৭৩ শতাংশ। এদিকে মোট মজুদের ৬২ শতাংশ রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করেছে রাশিয়া। এ পর্যন্ত উল্লেখিত সংস্থা ২৫ হাযার টন (১ টন=১০০০ কেজি) রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করেছে। আন্তর্জাতিক রাসায়নিক অস্ত্র বিষয়ক সনদের সদস্য ১৮৮টি দেশ ২০১২ সালের মধ্যে পৃথিবীকে রাসায়নিক অস্ত্র মুক্ত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

[হাযারো দুঃসংবাদের মধ্যে এটি একটি সুসংবাদ। এজন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ। তবে এ যেন পুরনো অকেজো মজুদ ধ্বংস করে নতুন মজুদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে না হয় (স.স.)]

নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ায় বছরে মারা যায় ২০ লাখ শিশু

বিশ্বে শিশু মৃত্যুর জন্য যে কটি রোগ সবচেয়ে বেশী দায়ী তার অন্যতম নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া। বিশেষ করে দরিদ্র দেশে এ দু'টি রোগে শিশুরা বেশী মারা যায়। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে প্রতি বছর ২০ লাখেরও বেশী শিশু এ দু'টি রোগে মৃত্যুবরণ করে, যা ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহারের ২৯ শতাংশ।

পাকিস্তানে ড্রোন হামলা চলবে

-মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

পাকিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলার স্বপক্ষে আবারও নিজেদের অনড় অবস্থান ব্যক্ত করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিওন প্যানেট্টা। ড্রোন থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পাকিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়া শীর্ষ আল-কায়েদা নেতা আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বীর মৃত্যুর দাবির দু'দিন পরেই ড্রোন হামলার স্বপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আবার পরিষ্কার করলেন প্যানেট্টা। উল্লেখ্য, চলতি বছর পাকিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলায় ১৫০ জনেরও বেশী মানুষ নিহত হয়েছে।

[জী হাঁ! পাকিস্তানীরা মানুষ নয়। ওরা মুসলমান। ওদের এভাবে মরাই কাম্য (স.স.)]

মুসলিম জাহান

আরাকানে নির্বিচারে মুসলিম হত্যা

মায়ানমারের আকিয়াব শহরের রাম্‌ব্রী গ্রামের এক রাখাইন শিক্ষিকা কর্তৃক ছাত্র পিটানোকে কেন্দ্র করে অভিভাবক ও শিক্ষকদের গালিগালাজ ও উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে এক শিক্ষিকা মারা যান। এর সূত্র ধরে আকিয়াব শহর থেকে গাড়ি যোগে তাবলীগ জামা'আতের একটি দল ইয়াঙ্গুন যাওয়ার পথে ৩ জুন টংগু নামক স্থানে পৌঁছলে রাখাইন যুবকরা গাড়ির হেলপারসহ তাবলীগ জামা'আতের ১০ সাথীকে পিটিয়ে হত্যা করে। নির্মম এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবীতে ৫ জুন মুসলমানরা ইয়াঙ্গুন শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এ ঘটনায় মুসলিম অধ্যুষিত পুরো আরাকান রাজ্যে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার আশংকায় ইয়াঙ্গুনে শীর্ষ মুসলিম নেতারা বৈঠক করে। ৮ জুন শুক্রবার জুম'আর ছালাতে মুসলমানদের জমায়েত করে শান্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৮ জুন পুরো আরাকানে জুম'আর ছালাতে মুছল্লীরা সমবেত হতে থাকে। মংডু শহরের মারকায মসজিদে জুম'আর ছালাত চলাকালে মংডু বৌদ্ধদের ইউনাইটেড হোটেল থেকে মসজিদের মুছল্লীদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এতে বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের সাথে রাখাইন ও সরকারী নাসাকা বাহিনীর সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। নাসাকার গুলীতে কয়েকজন মুসলিম নিহত হ'লে পুরো আরাকানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গা সামাল দিতে সেখানে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। জারী করা হয়েছে সান্ধ্য আইন। প্রতিনিয়ত এ দাঙ্গা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এ পর্যন্ত দাঙ্গায় চার শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। যাদের অধিকাংশই মুসলিম।

সরকারের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর হাতে সেখানে প্রতিনিয়ত খুন হচ্ছে মুসলিম রোহিঙ্গা যুবক-যুবতী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। রাখাইন যুবকদের হাতে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে মুসলিম যুবতীরা। দেশটির নাসাকা ও রাখাইন যুবকরা মিলে রোহিঙ্গা মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে তারা একযোগে চালাচ্ছে লুটতরাজ, মসজিদ ও বসতভিটাতে অগ্নিসংযোগ। অনেক রোহিঙ্গা মুসলিম সহায়-সম্পদ হারিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। মুসলমানদের রক্তস্রোতে ভাসছে পুরো আরাকান রাজ্য। অসহায় শিশু, কিশোর, ধর্ষিতা, মযলুম মানুষের আর্তনাদে সেখানকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

মিসরে ৩১ বছর পর যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার

মিসরে ৩১ বছর ধরে বলবৎ থাকা যরূরী অবস্থা অবশেষে তুলে নেয়া হ'ল। গত বছর দেশটির প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারকের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের অন্যতম দাবী ছিল যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার। গত ৩১ মে মধ্য রাতে যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নেয় দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

হোসনী মোবারকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মিসরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে দেশটির একটি আদালত। গত বছরের শুরুর দিকে তাঁর পদত্যাগের দাবীতে আন্দোলনরত বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দান ও হত্যার দায়ে গত ২ জুন আদালত এ রায় দিয়েছে। একই সঙ্গে মোবারকের আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাবীব আল-আদলীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে আদালত। তবে পুলিশের শীর্ষস্থানীয় ছয়জন কর্মকর্তা খালাস পেয়েছেন। বিচার শুরুর ১০ মাস পর এই রায় দেয়া হ'ল। কারাবন্দী মোবারক বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিন কাটাচ্ছেন।

১৯৮১ সালে মিসরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন হোসনি মোবারক। একটানা ১৮ দিনের গণবিপ্লবের ঢেউয়ে গত বছরের ১১ ফেব্রুয়ারী পদত্যাগে বাধ্য হন তিনি। তারপর থেকে ক্ষমতায় আছে দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদ।

মিসরে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠনে মতৈক্য

নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্যানেল গঠনে ঐক্যমতে পৌঁছেছে মিসরের রাজনৈতিক দলগুলো। একশ' সদস্যের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গ্রুপ থেকে কতজন করে প্রতিনিধি নেয়া হবে সে ব্যাপারে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ঐক্যমত অনুযায়ী, সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে সংসদ সদস্যদের জন্য ৩৯টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। সংসদে মোট আসনের ভিত্তিতে এগুলো বণ্টিত হবে। সে হিসাবে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ব্রাদারহুডের জাস্টিস অ্যান্ড ফ্রিডম পার্টি থেকে নেয়া ১৬ সংসদ সদস্য এবং সালাফীপন্থী হিযবুন নূর পার্টি থেকে ৭ জন সংসদ সদস্য প্যানেলে থাকবেন। বাকী আসনগুলো সংবিধান বিশেষজ্ঞ, মুসলিম ও খৃষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধি, মানবাধিকারকর্মী এবং অন্যান্য গ্রুপের প্রতিনিধিদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন ও বিতাড়ন বন্ধে মিয়ানমার সরকারের উপর অবিলম্বে চাপ সৃষ্টি করুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

প্রতিবেশী মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের মুসলিম জনগণের উপর স্থানীয় 'রাখাইন' নামধারী মগদস্যু ও সরকারী 'নাসাকা' বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি বলেন, রাখাইন ও নাসাকা বাহিনী মিলে অসহায় মুসলমানদের উপর যে নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়ন চালাচ্ছে, তা সভ্যজগতে তুলনাহীন। পালিয়ে আসা ক্ষুধার্ত মানুষগুলিকে সেদেশের বর্বর সেনাবাহিনী সাগরে ডুবিয়ে মারছে। এদিকে বিজিবি তাদেরকে জোর করে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ বাঁচার জন্য ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। অথচ আজ নির্যাতিত ভাইবোনদের আমরা আশ্রয় দিচ্ছি না। এটা করুণ ও মর্মান্তিক। তিনি বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি অনতিবিলম্বে মিয়ানমার সরকারের উপর মুসলিম নির্যাতন ও বিতাড়ন বন্ধে চাপ সৃষ্টি করার এবং অসহায় মানুষদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

[দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ জুন'১২, পৃঃ ২, কলাম ৬]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ফল পচন রোধক মেশিন আবিষ্কার

এখন থেকে পচনরোধে ফলে কার্বোহাইরয়েড বা ফরমালিন দেয়ার দরকার হবে না। এজন্য 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট' (বারি) আবিষ্কার করেছে 'হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট' নামক এক ধরনের যন্ত্র, যার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ফলমূল, এমনকি শাকসবজি দুই থেকে তিন সপ্তাহ সতেজ রাখা সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট-এর মহাপরিচালক ড. রফীকুল ইসলাম বলেন, এই মেশিনে ৫৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস গরম পানি ব্যবহার করা হয় যার মাধ্যমে ফলের মধ্যে এক ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন শক্তি তৈরী হয়। এ ব্যবস্থায় ফল ও অন্যান্য পচনজাত পণ্য শোধন করা হ'লে সারাদেশে প্রচুর পরিমাণ ফলমূল পচে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং এতে বিদেশে রফতানীও সহজ হবে।

[ধন্যবাদ দেশী বিজ্ঞানীদের! আল্লাহ্র অমূল্য নে'মত ফলমূলে বিষ ভরে দিয়ে যারা মানুষকে গোপন হত্যা করে চলেছে, ঐসব নরপশুদের বিরুদ্ধে এটি হবে একটি সুন্দর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। বিজ্ঞানকে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে তারাই হবেন সবচেয়ে বড় নেক্কার ও সৎকর্মশীল বান্দা। আল্লাহ তাদের মেধা ও গবেষণায় আরও বরকত দিন! (স.স.)]

জরিপ বিদ্যার ডিজিটাল যন্ত্র আবিষ্কার রুয়েট শিক্ষার্থীর

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ৪র্থ বর্ষের সিভিল বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ আল-হেলাল জরিপ বিদ্যার ডিজিটাল পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। তার ডিজিটাল এ পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে জমি অথবা যে কোন পরিমাপক হিসাবে সেকেলে পদ্ধতিতে যে ফিতা বা স্কেলের ব্যবহার করা হ'ত তার পরিবর্তে এখন থেকে খুব সহজেই এবং নির্ভুলভাবে ভূমি জরিপের কাজ করা সম্ভব হবে। যেসব জায়গায় ফিতা বা চেইন নিয়ে মাপা সম্ভব নয় যেমন নদীর ভেতরে কোন ব্রিজের উচ্চতা বা কোন উঁচু ভবনের কোন অংশের দৈর্ঘ্য সেসব জায়গায়ও এ যন্ত্রের সাহায্যে দূর থেকেই মাত্র কয়েকটি বাটন চাপ দেয়ার মাধ্যমে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যাবে। এমনকি এজন্য নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে বস্তুর কাছে যাওয়ারও দরকার নেই। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল দূরত্বটি প্রদর্শিত হবে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এমনকি দশমিক-এর পরে প্রায় ৪-৫ ঘর পর্যন্ত মান নেয়া যাবে। যা ফিতা দিয়ে মেপে বের করা প্রায় অসম্ভব। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী এ যন্ত্র তৈরীতে ব্যবহৃত হয়েছে সি প্রোগ্রামিং এবং মাইক্রো প্রসেসর চিপ।

[ধন্যবাদ ছাত্রটিকে! আল্লাহ তার মেধা আরও বর্ধিত করুন। দেশ ও মানবতার কল্যাণে আরও কাজ করার তাওফীক দান করুন- আমীন! (স.স.)]

ডিমের ভিতর ডিম!

আমেরিকার টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে কুকি স্মিথ নামে এক মহিলা তার মুরগির দেয়া ডিমের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন আরেকটি পরিপূর্ণ ডিম। তার পালা ৩টি মুরগির মধ্যে একটি অস্বাভাবিক বড় রকমের ডিম দেয়। ডিমটি স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং একটু ভারি। ডিমটি পেয়ে তিনি আশ্চর্য হয়ে ঘরে নিয়ে আসেন। এরপর ডিমটি ভাঙ্গতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আরেকটি পরিপূর্ণ ডিম। তবে এই ডিমটির খোলস ছিল একটু পাতলা।

[ডিমের মধ্যে ডিম এল। এবার বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করুন পৃথিবীতে মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম? অতঃপর জিজ্ঞেস করুন মুরগী বা ডিম কি আপনাআপনি সৃষ্টি হয়েছে, না তার কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন? (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

চট্টগ্রাম ২৫ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে যেলার বন্দর থানাধীন ইপিজেড সংলগ্ন ডক শ্রমিক কলোনী জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে ১ম বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুর্তাযা আলী, স্থানীয় দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম শহরের বুকে এটিই ছিল আহলেহাদীছদের প্রথম প্রকাশ্য কোন ইসলামী সম্মেলন। ফলে বাধাও ছিল ব্যাপক। বিদ'আতীরা আদাজল খেয়ে লেগেছিল সম্মেলন পণ্ড করার জন্য। প্রথমে ১৮ মে তারিখ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু 'আন্দোলন'-এর সম্মেলন পণ্ড করার হীন উদ্দেশ্যে স্থানীয় চরমোনাই গ্রুপ একই দিনে একই স্থানে সম্মেলনের ডাক দেয়। পরে বন্দর কর্তৃপক্ষের সমঝোতা বৈঠকে 'আন্দোলন' এর তারিখ এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২৫ তারিখ পুনর্নির্ধারিত হয়। ফলে বিদ'আতীরা ১ম দফা হেরে যায়। অতঃপর সম্মেলনের দিন স্থানীয় সকল মসজিদের ইমামরা জুম'আর ছালাতে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করতে নিষেধ করেন এবং আহলেহাদীছদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেন। আহলেহাদীছরা ওয়াহাবী, এরা বৃটিশদের দালাল, ইহুদীদের চর ইত্যাদি। এমনকি সম্মেলনস্থলে গিয়ে এরা সম্মেলনের প্যাণ্ডেলের কাজে বাধা সৃষ্টি করে ও মঞ্চ ভাঙ্গতে উদ্যত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনকে জানানো হ'লে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তারা সেখান থেকে বিতাড়িত হয় এবং সম্মেলন প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলে। অবশেষে বাদ আছর যথারীতি সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। চট্টগ্রাম শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আহলেহাদীছগণ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারণ শ্রোতা সম্মেলনে উপস্থিত থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তব্য শুনেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে চরমোনাইয়ের ২/৩ জন অনুসারী সম্মেলনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সম্মেলন পণ্ড করার সর্বশেষ চেষ্টা চালায়। বাহাছের নাম করে এরা সম্মেলনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আগত ২ জনকে গ্রেফতার করে বন্দর থানায় নিয়ে যান। অতঃপর রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। শ্রোতাদের মুহুর্মুহু শ্লোগানে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় বন্দর থানার ওসি ও এক প্লাটুন পুলিশ সম্মেলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্মেলন স্থলে অবস্থান করেন। এভাবে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে চট্টগ্রাম মহানগরীতে আহলেহাদীছ-এর আয়োজিত ১ম যেলা সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

যেলা ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সফর ও অডিট

নওগাঁ ১লা মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'সোনামণি' সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জয়পুরহাট ৪ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

যশোর ১৮ মে শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

পিরোজপুর ১৮ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আদর্শ বয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ যহূরুল হক -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

মেহেরপুর ২৩ মে বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন উত্তর শালিখা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। উল্লেখ্য যে, বাদ যোহর সেখানে যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদী ২৪ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে যেলার পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও

পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সুধী সমাবেশ শেষে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ যেলা অডিট সম্পন্ন করেন।

ঢাকা ২৫ মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বংশালস্থ ঢাকা যেলা কার্যালয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির।

সুধী সমাবেশ : একই দিন বাদ মাগরিব যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ তমীযুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক শামসুর রহমান আযাদী প্রমুখ।

পাবনা ২৫ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কুলুনিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা ২৬ মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে যেলার বুড়িচং বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ এবং বাদ মাগরিব যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার প্রমুখ। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ সহ বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা-পশ্চিম ২৮ মে সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সুধী সমাবেশ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম ও জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মাহফূযুর রহমান।

সাতক্ষীরা ৩১ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির ও কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। এ সময় যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লালমণিরহাট ২রা জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে যেলার মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম ও জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান।

রংপুর ৩রা জুন রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সুধী সমাবেশ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম ও জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমান।

দিনাজপুর-পূর্ব ১৫ জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার পাকুড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

বগুড়া ১৬ জুন শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় গাবতলী পুরাতন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা অডিট সম্পন্ন হয়। অডিট করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। এ সময়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। অডিট শেষে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক যেলা কর্মপরিষদকে আরো উৎসাহ ও দায়িত্বশীলতার সাথে 'আন্দোলন'-এর কার্যক্রম চালানোর আহ্বান জানান।

তাবলীগী সভা

উজিরপুর, বরিশাল ২ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার উজিরপুর উপযেলাধীন দক্ষিণ মাদারশী মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদারশী 'আল-মা'হাদ আদ-দ্বীনী সালাফিয়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইবরাহীম কাওছার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাব মুহাম্মাদ আয়েন আলী মাষ্টারকে আহ্বায়ক ও জনাব মুহাম্মাদ জসিম উদ্দিনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম যেলা (প্রস্তাবিত) আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর দক্ষিণ মাদারশী শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

যুবসংঘ

উজিরপুর, বরিশাল ২ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার উজিরপুর উপযেলাধীন দক্ষিণ মাদারশী মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে স্থানীয় ছাত্র, যুবক ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাদারশী 'আল-মা'হাদ আদ-দ্বীনী সালাফিয়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইবরাহীম কাওছার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ পাঁচরুখী মাদরাসা জামেয়া সালাফিয়ার ছাত্র হাফেয মুহাম্মাদ ইমরান। অনুষ্ঠানে হাফেয মুহাম্মাদ ইমরানকে আহ্বায়ক ও মুহাম্মাদ আব্দুল হককে যুগ্ম আহ্বায়ক করে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বরিশাল যেলা আহ্বায়ক কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট দক্ষিণ মাদারশী শাখা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১১ জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে বেগম মুহসিন ফাযিল মাদরাসা মিলনায়তনে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল হালীম। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাচোল ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নূরুল হুদা, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

মহিষখোচা, লালমণিরহাট ১৫ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল কাইয়ূমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, বর্তমান সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুনতাযির রহমান, অর্থসম্পাদক আশরাফুল আলম ও যেলা 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ।

মারকায সংবাদ

ছালাতুল ইস্তিসক্বা আদায়

রাজশাহী ৩-৫ জুন : দেশব্যাপী অনাবৃষ্টি, খরা ও প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে বাঁচার জন্য গত ৩, ৪ ও ৫ জুন সকাল ৬-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স) নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য 'ছালাতুল ইস্তিসক্বা' আদায় করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে**র ইমামতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত ছালাতে কমপ্লেক্স-এর শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ যোগদান করে মহান আল্লাহ্র নিকটে কায়মনোবাক্যে বৃষ্টি প্রার্থনা করেন। ১ম দিন সকাল ৭-টায় এবং পরের দু'দিন সকাল ৬-টায় দু'রাকআত ছালাত আদায়ের পর তিনদিনই মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইস্তিসক্বার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমানবর্ধক উপদেশ সহ সংক্ষিপ্ত খুৎবা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ বিষয় হল দো'আ করা। আল্লাহ তা'আলার নিকট খালেছ অন্তরে এই প্রচণ্ড দাবদাহে বৃষ্টি প্রার্থনা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে না তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। খুৎবা শেষে সকলে ক্বিবলামুখী হয়ে নিজেদের চাদর বা গামছা উল্টিয়ে দু'হাত উপুড় অবস্থায় চেহারা বরাবর উঁচু রেখে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দো'আ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালে মারকায প্রতিষ্ঠার পর এবারেই প্রথম 'ছালাতুল ইসতিসক্বা' আদায় করা হল।

মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমতে তৃতীয় দিন মঙ্গলবার বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীতে প্রথম স্বস্তির বৃষ্টি নেমে আসে। দীর্ঘ দেড় মাস পর এই বৃষ্টিতে শহরবাসী আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে এবং অনেকেই সিজদায়ে শোকরে লুটিয়ে পড়ে। আবহাওয়া অফিসের সূত্রমতে বিকেল ৪.৪০ মিনিট হতে ৬.৪০ মিনিট পর্যন্ত থেমে থেমে ৩১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। রাতেও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়েছে। এরপর থেকে মাঝে-মধ্যেই বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

ছালাতে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কমপ্লেক্স-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাদ্দিছ আব্দুল খালেক সালাফী, শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী, আকমাল হোসাইন, মকবূল হোসাইন, শিহাবুদ্দীন আহমাদ, শামসুল আলম, মোফাক্কার হোসাইন, মাসিক আত-তাহরীক -এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং এলাকার ও শহরের গণ্যমান্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ সাইফুল ইসলাম (৬৫) গত ১৪ মে ২০১২ইং রোজ সোমবার রাত ৮-টা ৪৫ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা কিডনী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে, ৩ মেয়ে, নাতী-নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি জয়পুরহাট যেলার কালাই থানাধীন মূলগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে কালাই উপযেলার আইআরডিবির চেয়ারম্যান ছিলেন।

পরের দিন বাদ যোহর মূলগ্রাম ঈদগাহ ময়দানে উক্ত ঈদগাহের ইমাম মাওলানা আব্দুল গফূরের ইমামতিতে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাহফূযুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : ছহীহ হাদীছ মতে তারাবীহর ছালাত কত রাক'আত?

-আব্দুর রহমান, বন্দর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ১১ বা ১৩ রাক'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে বিতর সহ ১১ রাক'আতের বেশী রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করেননি *(বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পঃ:; তিরমিযী ১-৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ)*। ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযান মাসে লোকদের নিয়ে ১১ রাকা'আত (তারাবীহ্‌র) ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩০২, হাদীছ ছহীহ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/১২২৮ রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ অনুচ্ছেদ)*।

বঙ্গানুবাদ মিশকাতে মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী মুওয়াত্ত্বা মালেক বর্ণিত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় দু'কুল বাঁচিয়ে লিখেছেন, 'সম্ভবতঃ হযরত ওমর (রাঃ) প্রথমে বিতর সহ এগার রাকাত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার আমলেই তারাবীহ বিশ রাকাত স্থির হয়, অথবা স্থায়ীভাবে ২০ রাকাতই স্থির হয়, কিন্তু কখনও আট রাকাত পড়া হইত' *(ঐ, ৩/১৯৯)*। উক্ত দাবী যে ভিত্তিহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক স্বীয় বঙ্গানুবাদ বুখারীতে ১১ রাক'আতের ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করেছেন *(ঐ, তারাবীর নামাজ অধ্যায় ২/১৯৬)* এবং তাঁর হিসাব মতে ২০ রাক'আতের সাত খানা যঈফ হাদীছ দিয়ে বুখারীর ছহীহ হাদীছকে রদ করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে অবশেষে বলেন, 'দুর্বল রাবী সম্বলিত কতিপয় হাদীছ একত্রিত ও একই মর্মে বর্ণিত হইলে তাহা গ্রহনীয় হইবে' *(ঐ)*।

মাওলানা মওদূদী একইভাবে কতগুলো জাল-যঈফ হাদীছ ও আছার একত্রিত করে যুক্তিবাদের সাহায্যে ছহীহ হাদীছ সমূহকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন *(দ্রঃ বঙ্গানুবাদ রাসায়েল ও মাসায়েল পৃঃ৩/২৮২-২৮৬ঃ বঙ্গানুবাদ বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ২/২৭৯-৮২ হা/১৮৭০-এর টীকা-২৮)*। অথচ এটাই সর্বসম্মত মূলনীতি যে, 'যখনই হাদীছ উপস্থিত হবে, তখনই যুক্তি বাতিল হবে'। এখানে ছহীহ হাদীছের বিধান সেটাই, যা উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপরে অপরিহার্য হ'ল, আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত এবং তাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা। তোমরা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করা হতে বিরত থাক। কেননা সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বায় বর্ণিত ইয়াযীদ বিন রূমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, 'লোকেরা ওমরের যামানায় ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত' একথাটি যঈফ। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি *(দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৩০২ টীকা-২)*। অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলীর যামানা থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা বাজারে চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি পরবর্তীকালে সৃষ্ট। হাদীছের বর্ণনাকারী ইমাম মালেক নিজে ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন, যা রাসূল (ছাঃ) হ'তে প্রমাণিত *(হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ৭১; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২)*।

বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ)*। ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, বিশ রাক'আত সম্পর্কে যত হাদীছ এসেছে, তার সবগুলিই যঈফ *(আরফুশ শাযী, তারাবীহ অধ্যায়, পৃঃ ৩০৯)*। হেদায়া-র ভাষ্যকার ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ)*। আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫পৃঃ)*। আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(নাছবুর রা'য়াহ ২/১৫৩ পৃঃ)*। আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়, যা বাজারে প্রচলিত আছে। এছাড়া ইবনু আবী শায়বাহ বর্ণিত বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাৎহু সির্রিল মান্নান লিতা'য়ীদি মাযহাবিন নু'মান, পৃঃ ৩২৭)*। দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ক্বাসিম নানুতুবী বলেন, বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত, যা বিশ রাক'আতের চাইতে যোরদার *(ফুয়ূযে ক্বাসিমিয়াহ, পৃঃ১৮)*। হানাফী ফিক্বহ কানযুদ দাক্বায়েক্ব-এর টীকাকার আহসান নানুতুবী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি; বরং আট রাক'আত পড়েছেন *(হাশিয়া কানযুদ দাক্বায়েক্ব, পৃঃ৩৬ঃ এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী প্রণীত ছালাতুত তারাবীহ নামক তথ্যবহুল গ্রন্থ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩-৭৮)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : ছালাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার আমীন বলা যাবে কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ, টাংগাইল।

উত্তর : ছালাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার আমীন বলা

সম্পর্কে ত্বাবারাণীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৭৫০৭)*। উক্ত বর্ণনার সনদে আবু ইসহাক্ব ও সা'দ ইবনু ছালত নামে দুইজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছেন। মুহাদ্দিছগণ তাদেরকে যঈফ বলেছেন *(তানক্বীহুল কালাম, পৃঃ ২৯৩-৯৪)*। এছাড়া এটি ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। তাই সূরা ফাতিহা শেষে একবারই আমীন বলতে হবে *(বুখারী হা/৭৮০; মিশকাত হা/৮২৫)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : মানুষ মারা গেলে তার রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। আসলে মৃতব্যক্তির দেহে শাস্তি হবে, না রূহে?

-খোরশেদ আলম
জামে'আ কাসেমিয়া, নরসিংদী।

উত্তর : মূলতঃ মৃতব্যক্তির তার রূহে শাস্তি হয়। তবে কেউ কেউ বলেন, দেহের উপর শাস্তি হয়। একথার জবাবে বলা যায়, দেহে আত্মা স্থাপনের পর রূহ ও দেহ উভয়েরই আযাব হয়। কেননা মানুষের শরীরের চালিকা শক্তিই হল রূহ। রূহবিহীন দেহ মূল্যহীন। তাছাড়া মালাকুল মঊত মৃতের জান কবয করার পর ইল্লিইয়ীন বা সিজ্জীনে তার রূহ নিয়ে যান। তাই রূহের উপরই শাস্তি হয়। সেকারণ রূহের মাগফেরাত কামনা করাই যথেষ্ট *(ফাতাওয়া ওছায়মীন ১৭/৪৩১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : ইমাম গাযালী (রহঃ) 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' বইয়ে লিখেছেন 'দ্বিপ্রহরের পরে মিসওয়াক না করা রোযার সুন্নাত'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-ফারূক, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং সর্বাবস্থায় মিসওয়াক করা সুন্নাত। চাই তা দিনের প্রথম ভাগে হোক কিংবা দ্বিপ্রহরের পরে হোক। আমির বিন রাবী'আ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছিয়াম অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি যদি উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৬ 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হুকুম দ্বারা ছিয়াম পালনকারী বা ছিয়ামহীন কাউকে খাছ করা হয়নি *(বুখারী 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'ছিয়াম পালনকারীর জন্য কাঁচা ও শুকনা বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ-২৭; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৪৬৮)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : আল্লাহ কুরআনের এক আয়াতে বলেছেন, তিনি সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন আবার অন্য আয়াতে সাতদিনের কথা বলেছেন। এর ব্যাখ্যা দানে বাধিত করবেন।

-শরীফুল ইসলাম
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : কুরআনের কোথাও সাত দিনের কথা নেই। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যা কুরআনের সাত জায়গায় এসেছে *(আ'রাফ ৫৪; ইউনুস ৩; হূদ ৭; ফুরক্বান ৫৯; সাজদাহ ৪; ক্বাফ ৩৮; হাদীদ ৪; দ্রঃ মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৪২২)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : জনৈক মাওলানা বলেন, 'সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো ছালাতে পড়ার ক্ষেত্রে প্রথম রাক'আতে যে সূরা পড়া হবে পরবর্তী রাক'আতে তার পরেরটা পড়বে। একটি বাদ দিয়ে তার পরেরটা পড়া মাকরূহ। বাদ দিয়ে পড়লে কমপক্ষে দু'টি বাদ দিতে হবে। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যাকারিয়া, বাগেরহাট।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ কর এবং কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর' *(আবুদাঊদ হা/৮১৮, ৮২০)*। তবে ধারাবাহিক পড়া উত্তম।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : জনৈক আলেম বলেন, জানাযা ছালাতের পূর্বে ভাষণ দেওয়া যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ভাষণ দিয়ে কবরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ সুলতানুল ইসলাম
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত দাবী সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানাযার ছালাতের পূর্বে উক্ত ভাষণ দেননি। বরং কবর খনন করলে তিনি অনতিদূরে বসে কবরের বর্ণনা দিচ্ছিলেন *(আহমাদ হা/১৮৫৫৭; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭৬)*। বর্তমানে জানাযার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ভাষণ দেওয়ার যে রীতি সমাজে চালু আছে তা শরী'আত সম্মত নয়। কেবল ইমাম উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে ঈমান বর্ধক কিছু সংক্ষিপ্ত কথা বলতে পারেন এবং উত্তরাধিকারীদের নিকট মাইয়েতের ঋণ পরিশোধ বিষয়ে বলতে পারেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯০৯; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১৭/২৩৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?' প্রশ্ন হল, তাহলে যে ব্যক্তি ছালাত-ছিয়াম পালন করে না, সে কি তার ছেলে-মেয়ে বা অন্যকে ছালাত আদায় করার কথা বলতে পারবে না?

-আব্দুর রাকীব
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কোন বিষয়ে আদেশ ও নিষেধকারীর জন্য দু'টি বিষয় ওয়াজিব। এক : নিজে সৎ কাজ করা। দুই : অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা। এক্ষেত্রে প্রথমটির ত্রুটির কারণে দ্বিতীয়টির ফারযিয়াত বাতিল হবে না। কেননা তার জন্য শরী'আতের বিধি-বিধান পরিপূর্ণরূপে পালন করা শর্ত নয় *(মুসলিম ১/২১৩ পৃষ্ঠার ১৭৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ; 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ)*। অতএব যেকোন সদুপদেশ যেকোন ব্যক্তি দিতে পারেন এবং এর ফলে তিনি নেকী পাবেন।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯): ফিৎরা কি ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত? যদি তাই হয় তাহলে যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদের ফিৎরা নেওয়া যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
মনিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদেরও ফিৎরা আদায় করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফিৎরা ফরয করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ফিৎরা হচ্ছে ফক্বীর-মিসকীনদের খাদ্য *(আবুদাঊদ, সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/১৮১৮)*। সুতরাং যাদেরকে মুসলমান বলা যাবে তাদের নিকট হতে ফিৎরা গ্রহণ করা যাবে।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০) : জানাযার ছালাতের দো'আগুলো পুরুষ ও মহিলার জন্য পার্থক্য করা যাবে কি?

-সুলতানুল ইসলাম
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য করার জন্য দো'আর সর্বনাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। কারণ এখানে উদ্দেশ্য হল 'মাইয়েত'। আর 'মাইয়েত' (ميت) শব্দটি স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয় *(আওনুল মা'বূদ হা/৩১৮৪-এর ভাষ্য ৮/৪৯৬; নায়ল ৫/৭২, ৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২২১)*।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, গর্ভবতী মায়ের পেটে কী আছে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু বর্তমানে আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। কুরআনের উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কী?

-ওবায়দুল্লাহ, ধানীখোলা, ময়মনসিংহ।

উত্তর : পবিত্র কুরআনে মায়ের পেটের কথা বলা হয়নি। বরং রেহেমের কথা বলা হয়েছে *(লোকমান ৩৪)*। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার মায়ের গর্ভে তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন *(যুমার ৬)*। তিনটি অন্ধকার বলতে প্রথমটি রেহেম, দ্বিতীয়টি মাশীমা (المشيمة) বা গর্ভফুল আর তৃতীয়টি হল পেট *(তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। আর রেহেমে তার আকার-আকৃতি কিছুই তৈরি হয় না। কেবল রক্তপিণ্ড ছাড়া।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : সূরা হূদের ১০৭ ও ১০৮ নং আয়াতে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা অনন্ত কাল সেখানে থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকবে। তবে আল্লাহ অন্য কিছু চাইলে ভিন্ন কথা'। উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, এক সময় জাহান্নামের শাস্তি থেকে সবাইকে রেহাই দেয়া হবে। চিরস্থায়ীভাবে কাউকে জাহান্নামে থাকতে হবে না। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মালেক
গড়েরমাঠ, মহিশালবাড়ি, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত আয়াত থেকে অনেকে বুঝেছেন যে, জাহান্নামে কাফেরদের শাস্তি স্থায়ী হবে না। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি হবে। অর্থাৎ যতদিন আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে ততদিন তাদের শাস্তি হবে। উক্ত ধারণা সঠিক নয়। কারণ আরবদের রীতি ছিল, কোন জিনিসের স্থায়িত্ব বুঝানোর জন্য তারা বলত هذا دائم دوام السماوات والارض 'আসমান ও যমীনের ন্যায় এটা চিরস্থায়ী'। আরবদের এই ভাষারীতিই কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কাফের-মুশরিকরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। এ বিষয়ে কুরআনের বহু আয়াতে বর্ণিত রয়েছে। যেমন বাক্বারাহ ১৬১-৬২, আলে ইমরান ৮৮; তওবা ৬৮; আহযাব ৬৪-৬৫; যুমার ৭২ প্রভৃতি। এছাড়া অনেক ছহীহ হাদীছে জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন- 'মৃত্যুকে সাদা-কালো মিশ্রিত রংয়ের একটি দুম্বার আকৃতিতে হাযির করে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে যবেহ করা হবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! মৃত্যুহীন স্থায়ী জীবন যাপন করো। হে জাহান্নামীরা! মৃত্যুহীন স্থায়ী জীবন যাপন করো *(বুখারী হা/৪৭৩০ 'তাফসীর' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৮৪৯)*। দ্বিতীয়তঃ আসমান ও যমীন থেকে জিনস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দুনিয়ার আসমান ও যমীনের ধ্বংসের পর পরকালে আল্লাহ যে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করবেন তা হবে চিরস্থায়ী। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে' *(ইবরাহীম ৪৮)*।

উক্ত আয়াতের শেষাংশে 'আল্লাহ যদি অন্য কিছু চান' দ্বারা পাপী মুমিনদের বুঝানো হয়েছে। যারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(তাফসীর ইবনু কাছীর হূদ ১০৭ ও ১০৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

উল্লেখ্য যে, একটি জাল হাদীছে এসেছে যে, 'একদিন জাহান্নামের অবস্থা এমন হবে যে, সেখানে একজন আদম সন্তানও আর অবশিষ্ট থাকবে না' *(ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ'আত ৩/২৬৮ 'জাহান্নাম খালি হয়ে যাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত জাল হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। মোটকথা, কাফের-মুশরিকরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। তবে ঈমানদার পাপীরা তাদের পাপের শাস্তি ভোগের পর রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতক্রমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : জানাযার ছালাতে শুধু ডান দিকে সালাম ফিরানো যাবে কি?

-আমীরুল ইসলাম
বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তর : যাবে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়া হা/৭৩৪, ৩/১৮১)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : জনৈক আলেম বলেন, আইয়ূব (আঃ)-এর শরীরে পোকা হওয়ায় তার পরিবার তাকে ছেড়ে চলে যায়। গ্রামবাসী তাকে গ্রামের বাইরে আবর্জনাস্থলে ফেলে আসে। একমাত্র স্ত্রী রহীমা তাকে ছেড়ে যায়নি। তিনি মানুষের বাড়ি কাজ করে তাকে খাওয়াতেন। একদিন খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে মাথার চুল বিক্রি করে খাদ্য সংগ্রহ করেন। যেহেতু আইয়ূব (আঃ) তার চুল ধরে নড়াচড়া ওঠাবসা করতেন। সেদিন আর তা করতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, আমি কি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। তখন শয়তান এসে তাকে বলল, আপনার স্ত্রী যেনা করে ধরা পড়ায় তার মাথার চুল কেটে নিয়েছে, তখন তিনি বললেন তাকে আমি দোররা মারবো। এই তাফসীরের সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
বোয়ালকান্দি মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। একজন নবীর স্ত্রী সম্পর্কে এধরনের কথা রটনা করা মহা অন্যায়। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে ও ইসরাঈলী বর্ণনায় এগুলো পাওয়া যায়। 'শয়তান এসে তাকে বলল, আপনার স্ত্রী যেনা করে ধরা পড়ায় তার মাথার চুল কেটে নিয়েছে' উক্ত কথার কোন ভিত্তি নেই। তবে তার (স্ত্রীর) খেয়ানতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন মর্মে কিছু বক্তব্য পাওয়া যায় *(তাফসীর ইবনু আব্দুস সালাম ১/৯৯৯; দ্রঃ নবীদের কাহিনী ১/২৫৫-৫৭)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : যখন আযানের জবাব দেয়া শেষ হবে তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাহলে তোমাকে প্রদান করা হবে' (আবুদাঊদ) 'আযান ও ইকামতের মাঝের দো'আ ফেরত দেয়া হয় না' (আহমাদ) এবং জুম'আর দিনে একটি সময় রয়েছে সে সময় কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে দান করেন (বুখারী, মুসলিম)। উক্ত স্থানগুলোতে হাত না তুলে মনে মনে বাংলায় চাওয়া যাবে কি?

-আমীনুল হক, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ছালাতের বাইরে উক্ত সময়ে কুরআনে ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ ছাড়াও নিজ নিজ ভাষায়ও মনে মনে দো'আ পড়া যাবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ১৩৩)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : ছালাতের সময় শরীরে মশা পড়লে মারা ও শরীর চুলকানো যাবে কী? অনেকে ছালাতে দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক তাকায়। এতে ছালাতের ক্ষতি হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-নোমান
মজপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মশা সহ ক্ষতিকর বা কষ্টদায়ক কীটপতঙ্গ মারা যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৯৮)*। তবে তা যেন বেশী করা না হয়। কারণ তা ছালাত বিনষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া ছালাতের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো খুবই অপসন্দনীয় কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের মধ্যে তাকানো হচ্ছে শয়তান কর্তৃক বান্দার মনোযোগ ছিনতাই করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮২)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : যারা সন্তান নষ্ট করে দেয় ক্বিয়ামতের দিন তাদের কী অবস্থা হবে?

-মুহাম্মাদ রায়হান
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সন্তান হত্যা করা মহাপাপ *(ইসরা ১৭/৩১)*। রাসূল (ছাঃ) একে বড় গুনাহ্ সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন *(মুসলিম হা/৮৬)*। সুতরাং তওবা না করে মারা গেলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে *(তাকভীর ৮১/৮-৯)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : অনেক সন্তান পিতা-মাতার মাথায় হাত রেখে কসম করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মাইনুল ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : পিতা-মাতার মাথায় হাত রেখে অথবা সন্তানের মাথায় হাত রেখে কসম করা শিরক। রাসূল (ছাঃ) এভাবে কসম করতে নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দ্বারা কসম করাকে শিরক অথবা কুফরী আখ্যা দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/৩২৪৮, ৩২৫১)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : হাদীছে নবী (ছাঃ)-এর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে বলা হয়েছে। এটা দরূদে ইবরাহীমী, না অন্য কোন দরূদ? কিভাবে কখন তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে হবে? রাসূল (ছাঃ) নিজেই নিজের উপর কিভাবে কোন দরূদ পড়তেন?

-আসাদুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ছালাত ব্যতীত অন্য যে কোন সময়ে নবী (ছাঃ)-এর নাম নিজে পড়লে অথবা অন্য কারো কাছে শুনলে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত দুরূদ 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পাঠ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) নিজের উপর দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করতেন এবং তা ছাহাবীগণকে শিখিয়ে দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯১০)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : ব্যবসা পণ্যের মোড়কে বিভিন্ন ছবি দেওয়া থাকে। এমতাবস্থায় করণীয় কি? ঐ সকল পণ্য কি বিক্রি করা যাবে?

-মুহাম্মাদ লোকমান
বখশীগঞ্জ, বদরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : এরূপ ছবি সম্বলিত পণ্য বিক্রি করা যাবে। মূলতঃ ছবিকে সম্মান দেখানো ও যত্ন করা উদ্দেশ্য হলে তা হারাম হবে। এরপরেও ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে চেষ্টা করতে হবে প্রাণীর ছবি থেকে দূরে থাকা আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর *(তাগাবুন ১৬)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : যারা ছালাত আদায় করে না তাদের দিয়ে কবর খোড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ইসমাঈল
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইবাদত হিসাবে মুছল্লী ব্যক্তি দ্বারা খবর খনন করাই উচিত *(ছহীহ তারগীব হা/৩৪৯২)*। তবে প্রয়োজনের তাকীদে কবর খনন এবং লাশ বহনের কাজে ছালাত পড়ে না এমন ব্যক্তির সহযোগিতা নেয়া যাবে। কিন্তু কাফন পরানো, কবরে নামানো এবং দাফনের কাজগুলো তাদের দ্বারা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : ছহীহ হাদীছ দ্বারা দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে থাকলে অন্যান্য হাদীছের উপর আমল করার প্রয়োজন আছে কি? যেমন হাসান, যঈফ, জাল ইত্যাদি।

-এফ. রহমান, গাযীপুর।

উত্তর : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েছে *(মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩১৮)*। ছহীহ এবং হাসান উভয় হাদীছই গ্রহণযোগ্য। অন্যান্য হাদীছ বলতে যঈফ, জাল ও বানোয়াট হাদীছ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এধরনের হাদীছের উপর কোন অবস্থাতেই আমল করা যাবে না *(ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ, পৃঃ ১১৩)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বানোয়াট হাদীছ বর্ণনাকারীদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে উম্মতের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : বাড়ির সাথে পর্যায়ক্রমে কবর আছে। যার ফলে বসবাসে সমস্যা হয় এবং কবরের উপরও অত্যাচার হয়। এমতাবস্থায় কবর গোরস্থানে স্থানান্তর করা যাবে কি? কবরে হাড় যদি না থাকে তাহলে কি করতে হবে? নতুন করে জানাযা করতে হবে কি?

-নযরুল ইসলাম, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত কবর যদি পুরাতন হয় এবং মৃত ব্যক্তির হাড়সহ কোন চিহ্নই যদি না থাকে, তাহলে সে স্থানকে চাষাবাদসহ প্রয়োজনে যে কোন উপকার গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৭২ পৃঃ; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৯১)*। তাছাড়া সমস্যা হলে স্থানান্তরও করা যাবে। এতে হাড়হাড্ডি পাওয়া গেলে সেগুলোকে কবরস্থানে একটি গর্ত

করে পুঁতে দিবে। পুনরায় জানাযা পড়তে হবে না।

তবে বিনা কারণে কোন কবরকে স্থানান্তর ও নষ্ট করা যাবে না। মুসলিম ব্যক্তিকে তার জীবদ্দশায় যেমন কষ্ট দেওয়া যায় না। তেমনি মৃত্যুর পরেও কষ্ট দেওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মৃত মুসলিমের হাড় ভাঙ্গা জীবিত অবস্থায় তার হাড় ভাঙ্গার মতই *(ছহীহুল জামে' হা/৩২৪৩)*। তাছাড়া শরী'আতে কবর যিয়ারতের গুরুত্ব সমধিক।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : রামাযান মাসে কোন ব্যক্তি সাহারী খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে জেগে দেখল যে, সময়সূচী মোতাবেক আর মাত্র ১ মিনিট বাকি আছে। সে ব্যক্তি ছিয়াম পালনের নিয়তে এক গ্লাস পানি পান করে নিল। এক্ষণে সাহারী না খাওয়ার কারণে তার ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-আহমাদুল্লাহ, কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তর : সাহারীর সময়সূচীর ১ মিনিট বাকী থাকলেও সে সময় এক লোকমা খাদ্য বা এক ঢোক পানি পান করলে সাহারী আদায় হয়ে যাবে এবং সাহারী খাওয়ার ফযীলত পাওয়া যাবে। তাছাড়া সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়ামের নিয়ত করলে ছিয়াম আদায় হয়ে যাবে *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪/১৭৫ হা/১৯২২-এর আলোচনা দ্রঃ 'সাহারী ওয়াজিব নয়' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ২/২২২)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : ওষুধের দোকানে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ আছে। এর সাথে মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের জন্ম বিরতিকরণ বিক্রয় করা হয়। এসব ক্রয়-বিক্রয় করা কি বৈধ?

-ডাঃ মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তর : জন্মনিরোধক কিছু ব্যবহার করা মৃত্যু বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশংকা ব্যতীত ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু বর্তমান সমাজে জন্মনিরোধ একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। এমতাবস্থায় এরূপ ঔষধ বিক্রয় করা গুনাহের কাজে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : জনৈক ব্যক্তি তিন বছর আগে যৌতুক নিয়ে বিয়ে করেছে। স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করেনি। বর্তমানে সে যৌতুক এবং মোহরানা যেকোন একটি পরিশোধ করতে সক্ষম। এখন কোন্‌টি আগে পরিশোধ করবে?

আযাদুর রহমান
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমে যৌতুক পরিশোধ করে নিজেকে দায়মুক্ত করতে হবে। মোহরানা পরিশোধ করতে দেরী হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : ছালাত আদায় করা অবস্থায় মোবাইল ফোন বেজে উঠলে করণীয় কী?

-শাহাদাত, নবাবপুর রোড, ঢাকা।

উত্তর : ছালাতে প্রবেশের আগেই মোবাইল বন্ধ করতে হবে। যদি ভুলে যায় এবং ছালাতের মধ্যে মোবাইল ফোন বেজে ওঠে, তবে তা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : স্ত্রী স্পষ্ট অনুভব করছে যে, তার স্বামী অবৈধ পথে উপার্জন করছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কী?

-আব্দুল করীম
বল্লা, টাঙ্গাইল

উত্তর : এমতাবস্থায় স্ত্রীর উচিত হবে স্বামীকে বাধা প্রদান করা। কারণ এটি একটি অন্যায় কাজ আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : কতক পরিবারে দেখা যায় বিয়ের সময় যৌতুক গ্রহণ না করলেও বিয়ের পরে নানা রকম কষ্ট দেয়। ফলে শ্বশুরবাড়ীর পক্ষ থেকে জামাইর বাড়ীতে রামাযান মাসে জাঁকজমকপূর্ণ ইফতার, ঈদ উপলক্ষে মূল্যবান পোষাক, কোরবানীর সময় কোরবানীর পশু, আম-কাঠালের দিনে আম-কাঁঠাল পাঠাতে হয়। এগুলো কি শরী'আত সম্মত?

-রফীকুল ইসলাম
তুলাগাঁও, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত আচরণ যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। এই যুলুম ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য ঘন অন্ধকার হিসাবে দেখা দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৩)*। তবে ইসলাম পরস্পরকে হাদিয়া দিতে উৎসাহিত করেছে। পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টিতে তা সহায়ক ভূমিকা রাখে *(ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪)*। অতএব হাদিয়া হিসাবে বিভন্ন সময়ে স্ত্রী ও জামাইকে উভয়ের শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় কিছু দেয়া হলে তা অবশ্যই নেওয়া যাবে।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, শিলাবৃষ্টি আল্লাহর গযব। উক্ত বৃষ্টি ধরাও যাবে না, খাওয়াও যাবে না। এটা কতটুকু সত্য?

-নাফীসা, কৃষ্ণপুর, পাবনা।

উত্তর : উক্ত কথা সঠিক নয়। কারণ অতি বৃষ্টি কোন কোন সময়ে গযব হিসাবে দেখা দিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে পানি পান করা বা ব্যবহার করা নিষেধ নয়। অনুরূপভাবে শিলাবৃষ্টিও ধরতে এবং খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা সব কিছুকেই মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(বাক্বারাহ ২৯)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : সরকারকে অবহিত না করে অন্য দেশের পণ্য আমদানি করে ব্যবসা করলে বৈধ হবে কি?

-শহীদুল্লাহ, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : যে পণ্য আনতে সরকারী অনুমতির প্রয়োজন হয়, সে পণ্য সরকারী ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসলে সে পণ্যের ব্যবসা অবৈধ হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় টিকা বা ইনজেকশন নেয়া যাবে কি?

-সুলতান, মনিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : যেসব টিকা বা ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ছিয়াম অবস্থায় রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)

ছিয়াম অবস্থায় (রোগ মুক্তির জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন' *(বুখারী, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৩২; মির'আত ৬/৪০৬ পৃঃছিয়াম অধ্যায়)*। অনুরূপ হাঁপানী রোগের জন্য ছিয়াম অবস্থায় ইনহেলার নেওয়া যায়।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : যখন মসজিদে বা টেলিভিশনে আযান হয়, তখন মহিলা মাথায় ওড়না অথবা কাপড় তুলে দেয়। শরী'আতে এধরনের কোন বিধান আছে কি?

-মুয়াযযিম
ঘাটবিলা, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : ইসলামী শারী'আতে আযানের সময় মাথায় কাপড় দেয়ার কোন বিধান নেই। ইসলাম পরপুরুষের সামনে মাথা ঢাকাসহ সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছে *(নূর ৩১)*। অতএব শুধুমাত্র আযানের সময় এরূপ করাটা কুসংস্কার মাত্র।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : আল্লাহর নবী জীবিত না থাকলে সালাম নেন কীভাবে?

-আব্দুল বারী, মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর : নবী (ছাঃ) জীবিত নন বরং তিনি মারা গেছেন। আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক প্রাণীকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে *(আম্বিয়া ৩৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল ও তারাও মরণশীল *(যুমার ৩০)*। আমাদের নবী (ছাঃ)-কে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬১, ৬৪)*। সালাম নেওয়ার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার নিকট আত্মা ফেরত দেয়া হয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯২৫)*। অর্থাৎ সালামের বিষয়টি তাকে জানানো হয় *(মিরক্বাত ২/৭৪৩)*। পরকালের ঘটনাবলী মানুষ অনুভব করতে পারে না। আত্মার জগতের বিষয়টিও অনুরূপ *(মিরক্বাত ৩/২৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : বর্তমানে সরকার যে বয়স্ক ভাতা দেয় এই টাকা কাদের জন্য বৈধ? ধনী লোকেরা তাদের আব্বা-আম্মার জন্য এই টাকা গ্রহণ করতে পারবে কি?

-আব্দুল জাব্বার, মহিষখোচা, লালমণিরহাট।

উত্তর : সরকার বয়স্ক ভাতা ঐসব লোকদের জন্যই প্রদান করে যারা অসহায় এবং যাদের কোন অবলম্বন নেই। এক্ষণে কোন সম্পদশালী ব্যক্তি যদি সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে এ ভাতা তার পিতা-মাতার জন্য গ্রহণ করে তা তার জন্য কখনোই বৈধ হতে পারে না। বরং সন্তান স্বয়ং পিতা-মাতার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। কারণ সন্তানের সম্পদ মূলত পিতা-মাতারই সম্পদ। হাদীছে এসেছে 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতা-মাতার। নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ তোমাদের পবিত্র উপার্জন। কাজেই তোমাদের সন্তানদের পবিত্র উপার্জন হতে তোমরা খাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩৫৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : আল্লাহ তা'আলা যদি সাত আসমানের উপরে থাকেন, তাহলে আমরা সাত আসমানের নীচে পৃথিবীতে কার সামনে দাঁড়িয়ে ছালাত বা ইবাদত করি? এই বিশ্বাসে ইবাদত করলে ইবাদত হবে কি? চারতলায় রাখা কোন মূর্তিকে একতলায় দাঁড়িয়ে পূজা করাকে হিন্দুরা সঠিক মনে করে না। তাহলে কি আমরা আল্লাহর গুণাবলীকে সিজদা করি? আল্লাহ পাকের সত্তা কি আরশে সমাসীন?

-মূসা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা আরশে থাকলেও তিনি জ্ঞান ও দৃষ্টির দিক দিয়ে বান্দার গ্রীবাদেশের রগ অপেক্ষাও নিকটে থাকেন *(ক্বাফ ১৬)*। আর ঈমানের উচ্চ স্তর হল, ইবাদত সমূহ এই বিশ্বাস নিয়ে করা যে, যেন বান্দা তাঁকে সামনে দেখছে। তা না হলে আল্লাহ যেন বান্দাকে দেখছেন। এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর *(বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২)*। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে চেনার জন্য মূর্তি সামনে রাখা কুফরী কাজ। আর হিন্দুর বিশ্বাসের সাথে একজন মুসলিমের বিশ্বাসের কিভাবে তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ১১)*। হিন্দুরা যে তলা থেকেই পূজা করুক না কেন, তাদের মূর্তি কানেও শুনে না চোখেও দেখে না; কারু উপকার বা ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখে না *(ফাতির ১৩ ও ১৪)*। অথচ আমাদের আল্লাহ অদৃশ্যে থেকে বান্দার সবকিছু দেখেন ও শোনেন। বস্তুতঃ ঈমান বিল-গায়েব মুত্তাক্বীদের উন্নততম গুণ *(বাক্বারাহ ৩)*। অতএব বিশ্বাস রাখতে হবে যে, বান্দা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদত করছে।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে, আয়েশা (রাঃ)-এর বয়স যখন ৭ বছর, তখন আবুবকর (রাঃ) প্রথমে ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে, অতঃপর ওছমান (রাঃ)-এর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাঁরা অসম্মতি জানান। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উক্ত বর্ণনা কি সঠিক? কারণ হাদীছে আছে, আল্লাহ তা'আলা মা আয়েশা (রাঃ)-কে অনেক পূর্বেই স্বপ্নযোগে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর: উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা আগেই স্বপ্নযোগে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহের সুসংবাদ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৩৮৯৫; মুসলিম হা/৬৪৩৬)*। বিবাহের উক্ত প্রস্তাব আয়েশা (রাঃ) ক্ষেত্রে নয়, বরং ওমর (রাঃ) তাঁর মেয়ে হাফছা (রাঃ)-এর বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে ওছমান (রাঃ)-কে দেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-কে দেন। কিন্তু তাঁরা রাযী না হ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন *(বুখারী হা/৪০০৫)*। আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহের ব্যাপারে বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে ৬ বছর কয়েক মাসের কথা। আর মুসলিমের বর্ণনায় ৭ বছরের কথা রয়েছে *(মির'আতুল মাফাতীহ ১০/৭১)*। ৯ বছর বয়সে স্বামীর বাড়ীতে যান *(বুখারী হা/৫১৩৪; মুসলিম হা/৩৫৪৬)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : ইবলীস শয়তানকে ফেরেশতাদের সরদার করা হয়েছিল কেন?

-নাজমুল হুদা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ইবলীস ফেরেশতাদের সরদার ছিল একথা ঠিক নয়। তবে ইবলীস কাজে-কর্মে ফেরেশতাদের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং ইবাদতে তাদের সদৃশ হয়েছিল। একারণে তাকে ফেরেশতাদের সাথে সম্বোধন করা হয়েছে *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা*

কাহফ ৫০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। এতে সে অহংকার করে। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেন।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : গর্ভবতী মহিলা কালো জিরা খেলে পেটের সন্তান কালো হয়। এমনকি স্বামী পশু-পাখি যবেহ করলেও গর্ভে থাকা সন্তানের অমঙ্গল হয়। উক্ত কথার কোন ভিত্তি আছে কি?

-নাছরুল্লাহ
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

উত্তর : এগুলো সামাজিক কুসংস্কার। বরং উক্ত বর্ণনা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫২০)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : জনৈক মাওলানা বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে দুনিয়া সৃষ্টি করতেন না। নবীকে সৃষ্টি করে ময়ূররূপে গাছে রাখা হয়। তার শরীরের ৭ ফোটা ঘাম হতে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়। আর তাওরাতে আছে আল্লাহ পৃথিবী ৭ ধাপে সৃষ্টি করেছেন। কোনটি সঠিক?

-আবু আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত দাবী পুরোটাই মিথ্যা ও বানোয়াট। আল্লাহ নবীকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবী সৃষ্টি করতেন না এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২)*। ময়ূররূপে গাছে রাখা হয় এবং শরীরের ৭ ফোটা ঘাম হতে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয় এগুলো সব বানোয়াট কথা। পৃথিবীকে ৭ ধাপে সৃষ্টি করা হয়েছে একথা ঠিক নয় বরং পৃথিবীকে ৬ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে *(আ'রাফ ৫৪; হূদ ৭)*।

হিজরী : ১৪৩৩		সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)					খৃষ্টাব্দ : ২০১২		
হিজরী	খৃষ্টাব্দ	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়	হিজরী	খৃষ্টাব্দ	বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
০১ রামাযান	২১ জুলাই	শনিবার	৩-৫৮	৬-৪৭	১৬ রামাযান	০৫ আগস্ট	রবিবার	৪-০৬	৬-৩৯
০২ রামাযান	২২ জুলাই	রবিবার	৩-৫৯	৬-৪৬	১৭ রামাযান	০৬ আগস্ট	সোমবার	৪-০৬	৬-৩৮
০৩ রামাযান	২৩ জুলাই	সোমবার	৩-৫৯	৬-৪৬	১৮ রামাযান	০৭ আগস্ট	মঙ্গলবার	৪-০৭	৬-৩৮
০৪ রামাযান	২৪ জুলাই	মঙ্গলবার	৩-৫৯	৬-৪৫	১৯ রামাযান	০৮ আগস্ট	বুধবার	৪-০৭	৬-৩৭
০৫ রামাযান	২৫ জুলাই	বুধবার	৪-০০	৬-৪৫	২০ রামাযান	০৯ আগস্ট	বৃহস্পতিবার	৪-০৮	৬-৩৬
০৬ রামাযান	২৬ জুলাই	বৃহস্পতিবার	৪-০১	৬-৪৫	২১ রামাযান	১০ আগস্ট	শুক্রবার	৪-০৮	৬-৩৫
০৭ রামাযান	২৭ জুলাই	শুক্রবার	৪-০১	৬-৪৪	২২ রামাযান	১১ আগস্ট	শনিবার	৪-০৯	৬-৩৫
০৮ রামাযান	২৮ জুলাই	শনিবার	৪-০২	৬-৪৪	২৩ রামাযান	১২ আগস্ট	রবিবার	৪-০৯	৬-৩৪
০৯ রামাযান	২৯ জুলাই	রবিবার	৪-০২	৬-৪৩	২৪ রামাযান	১৩ আগস্ট	সোমবার	৪-০৯	৬-৩৩
১০ রামাযান	৩০ জুলাই	সোমবার	৪-০৩	৬-৪৩	২৫ রামাযান	১৪ আগস্ট	মঙ্গলবার	৪-১০	৬-৩৩
১১ রামাযান	৩১ জুলাই	মঙ্গলবার	৪-০৩	৬-৪২	২৬ রামাযান	১৫ আগস্ট	বুধবার	৪-১০	৬-৩২
১২ রামাযান	১ আগস্ট	বুধবার	৪-০৪	৬-৪১	২৭ রামাযান	১৬ আগস্ট	বৃহস্পতিবার	৪-১১	৬-৩১
১৩ রামাযান	২ আগস্ট	বৃহস্পতিবার	৪-০৪	৬-৪১	২৮ রামাযান	১৭ আগস্ট	শুক্রবার	৪-১১	৬-৩০
১৪ রামাযান	৩ আগস্ট	শুক্রবার	৪-০৫	৬-৪০	২৯ রামাযান	১৮ আগস্ট	শনিবার	৪-১২	৬-২৯
১৫ রামাযান	৪ আগস্ট	শনিবার	৪-০৫	৬-৪০	৩০ রামাযান	১৯ আগস্ট	রবিবার	৪-১২	৬-২৯